KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No : KLMLGK 200	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৩/- ২৬/- ২৪/- ২৭/-	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৮২ ॥ Sep 1975 কার্তিক ১৩৮২ ॥ Nov 1975 আষাঢ় ১৩৮৩ ॥ July 1976 ভাদ্র ১৩৮৩ ॥ Sep 1976
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

CD Ref No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পূর্ব রেলওয়ে

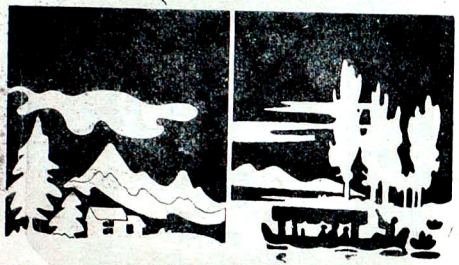

হিল কনসেশন রিটার্ন টিকিট
এবং শ্রীনগরের জন্য
রেল-বাস রিটার্ন টিকিট

দেশের বিভিন্ন শৈলনগরীতে ভ্রমণের জন্য কেবলমাত্র রেল-পথের অংশটুকুর জন্য দেড়াভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা-জনক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি গত পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। টিকিটের মেয়াদ তিনমাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। যে কোন যাত্রাশুরুর স্টেশন থেকে শৈলনগরীর দূরত্ব কমপক্ষে ৮০০ কিলোমিটার হতে হবে। এই ধরনের টিকিট ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

শ্রীনগরের জন্য এই সুবিধাজনক ভাড়ার যাতায়াতের টিকিট হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলিকাতা ও হাওড়ার সিটি বুকিং অফিসগুলি হ'তে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পূর্ব রেলওয়ের পাটনা, ধানবাদ, গয়া, ভাগলপুর ও আসানসোল স্টেশন থেকেও পাওয়া যাবে। রেলভাড়া ছাড়াও জম্মু তাওয়াই ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী অংশটুকুর জন্য ৪০ টাকা হারে যাতায়াতের বাসভাড়া একই সঙ্গে নেওয়া হবে, তবে ভ্রমণের সময়ে চালু বাসভাড়া অনুযায়ী এই হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তিন-বছরের উপর এবং বারো বছরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্যও একই হারে বাসভাড়া লাগবে।

তবে কোনক্রমেই ১৯৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্য-রাত্রির পরে শৈলনগরী অভিমুখে যাত্রা করা যাবে না।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে কলিকাতা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের ইনফরমেশন ব্যুরোর সুপারভাইজারের সঙ্গে, অথবা বিভিন্ন স্টেশনে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট
পূর্ব রেলওয়ে
কলিকাতা

TCP/ER 280/76 R2 BEN

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র তেরশ' বিরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ কাব্য ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ১৮১

লোকসংস্কৃতির নৃবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ॥ রেবতীমোহন সরকার ১৯১

লিপি-ফলকে বাঙালীর কাব্যচিন্তা ॥ ত্রিপুরা বসু ২০০

বাদশাহী সড়ক ॥ গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২১০

আলোচনা : শিল্পহীন প্রসঙ্গে ॥ পঙ্কধর ভট্টাচার্য ২১২

সমালোচনা : শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত ॥ সন্তোষকুমার বসু ২১৪

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আসুন বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়ামাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।

রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন : ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 200R

ভাদ্র তেরশ' বিরাশী | সমকালীন | ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ কাব্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

শ্রীজয়দেবের একটি অসমাপ্ত শ্লোকের পাদ পূরণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রবাদ প্রবচনটি প্রবল হয়ে ছড়িয়ে আছে শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে, অন্ততঃ বিশ্বাস-ভক্তিবাদিদের চিত্তে তো বটেই; অ-লৌকিক ঘটনা যদি কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিবকে নিয়ে হয়, তবে তো আরও গাঢ় হয় তাঁদের চিত্তে। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের জীবন কাহিনীর সঙ্গে এমন একটি অলৌকিক প্রবাদ জড়ান আছে, সেটিকে বাদ দিলে দ্বাদশ শতাব্দীর লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব এবং তার রচিত খণ্ডকাব্য 'গীতগোবিন্দ' নামে সংস্কৃত সাহিত্য শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক এক খানি গ্রন্থ এই মাত্র পরিচয় অবশিষ্ট থাকে।

প্রকৃত পক্ষে জয়দেবের জীবন কথা কিছুই জানা যায় না। জয়দেব বাঙালী অথবা অবাঙালী, তিনি বিবাহিত ছিলেন কিংবা কবি মানুষের জীবনসঙ্গিনী লাভের মত কোন ব্যাপারে রমণী লাভ করেছিলেন তাও জানা যায় না।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের নজীর হিসাবে পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে পাঁচজন পণ্ডিত কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে জয়দেব ও একজন। এটাও যে একান্ত ইতিহাসগত তাও নয়, তবে সুপ্রাচীন উক্তি। উক্তিটি এই ভাবে চলে আসছে—'লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় দ্বার দেহলীতে (উপরের চৌকাঠে) একটি উৎকীর্ণ শ্লোক ছিল—'

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

অর্থাৎ লক্ষণ সেনের সভায় গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি এবং কবিরাজ এই পাঁচজন পণ্ডিতরত্ন

বিরাজ করতেন। এখানে পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছেন কবিরাজই ধোয়ী কবি। যার প্রখ্যাত খণ্ডকাব্য 'পবনদূত'। ধোয়ী কবিকেই যে কবিরাজ বলা হয়েছে এর সমর্থন জয়দেবের গীতগোবিন্দেও পাওয়া যায় তিনি বলেছেন—'

বাচঃ পল্লবয়িত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎ-প্রমেয়-রচনৈঃ রাচার্য্য গোবর্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি ক্ষ্মাপতিঃ॥

অর্থাৎ বাক্যবিন্যাসে সে সুপরিচিত কবি উমাপতি, কঠিন শব্দ চয়ন করে এবং দ্রুততার সঙ্গে তাকে বিন্যস্ত করতে দক্ষ কবি শরণের মান্যতা খুবই প্রসিদ্ধ আদিরসের ছোট ছোট কবিতা রচনায় দক্ষ গোবর্ধন আচার্য্যের সঙ্গে কারোর তুলনাই চলে না, শ্রুতির হিসাবে কবিরাজ ধোয়ীর নামও অগ্রগণ্য তবুও কবি জয়দেবের আসন এঁদের মধ্যে সর্বপরিচিত কারণ তিনি রসময় রচনা করতে সর্বাধিক পটু॥ (গীতগোবিন্দ ঃ)

গীত গোবিন্দের গোড়ায় এইটুকু আত্মপরিচয় আর শেষে জয়দেব বলেছেন যাঁর পিতা ভোজদেব মাতা বামা দেবী এবং বন্ধু পরাশর প্রভৃতি সেই জয়দেবই এই গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন।

শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামা-
দেবী সুতশ্রী জয়দেবকস্য।
পরাশরাদি প্রিয় বন্ধু কণ্ঠে
শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু॥ (গীতগোবিন্দ ১২।৩০)

অতএব জয়দেবের নিজের লেখায় বোঝা যায় না সত্যই তিনি লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি পণ্ডিত ছিলেন কিনা। অপর দিকে ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যের শেষে যে চারটি শ্লোক লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাতে দেখা যায় তিনি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর সম্মান লাভ করে ছিলেন—স্বর্ণদণ্ড, চামর, কনকলতিকা এবং হস্তিব্যূহ (অথর্ববেদে হস্তিব্যূহ অর্থে হস্তি, দেহরক্ষী ও ভূসম্পৎ। কালে হস্তিব্যূহের অর্থ—হস্তিদন্তের দ্বারা ছাতার বাঁট তৈরী করে তাতে উৎকৃষ্ট আবরণ থাকলেই হস্তিব্যূহ বলা হোত) এই সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিই কবিধরনীধর চক্রবর্তী শ্রীধোয়ী।

হস্তিব্যূহং কনক লতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাৎ-অলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকল রসিক প্রীতি হোতো মনিষী
কাব্যংসারস্বতমিব মহামন্ত্রেং-জগাদ॥ (পবন দূত—১০১)

ধোয়ী কবির নিজের রচনায় কবিক্ষ্মাপতি এবং জয়দেবেরও রচনায় ধোয়ী কবিক্ষ্মপতিঃ সমানোক্তি দেখেই পণ্ডিতরা স্থির করেছেন জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন।

কিন্তু প্রাচীন কবিদের সুক্তিমালায় জয়দেবের কোন কবিতা দেখা যায় না। 'রসমঞ্জরী' নামে একখানি রস ও অলংকার সম্পর্কে যে প্রখ্যাত গ্রন্থ, তার রচয়িতার নাম ও জয়দেব এবং 'পীযূষলহরী' নামে যে গ্রন্থ তারও রচয়িতার নাম জয়দেব। এসব ক্ষেত্রে অনেক পণ্ডিতই ভ্রমে পড়ে মন্তব্য করেন

তিনখানি গ্রন্থের প্রণেতা একই জয়দেব।

তা যাক, গীতগোবিন্দের রচয়িতা যে জয়দেব, তাঁর কাব্যখানি সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন চিহ্নিত পুস্তক, তেমনি নাকি অতুলনীয় বৈষ্ণব প্রীতিরও কাব্য। জয়দেব নিজেই তা ব'লেছেন এই গীতগোবিন্দ কাব্যটি কৃষ্ণতন্ময় পণ্ডিত কবি জয়দেবের রচিত, এটি পাঠ করে তাঁরা খুব আনন্দ লাভ করবেন, যাঁরা গান্ধর্বকলায় (সঙ্গীতশাস্ত্রে) কৌশল লাভ করতে চান, যাঁরা বৈষ্ণবীয় অনুধ্যানে তৎপর হতে চান এবং যাঁরা শৃঙ্গার-তত্ত্ববিবেকী হয়ে কাব্যের লীলাবাদ বুঝতে চান।

যদ্গান্ধর্বকলাসু কৌশল মনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গার বিবেক-তত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্বং জয়দেব-পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের এই শ্লোকটির গুরুত্ব এত বেশী যে, দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার যাঁরা সামাজিক ও বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত ছিলেন তাঁরা কি ধরনে কৃষ্ণময় জয়দেব কবির রচিত এই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়টির অনুশীলন করতেন তার একটি ঝরঝরে তরতরে চিত্র পাওয়া যায়—

মারাগ্নি রতি-কেলি-সঙ্কুল-রণারম্ভে তয়াসাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্বল্লিরুৎ কম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষ-রস স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি॥

এই শ্লোকটি গীতগোবিন্দ কাব্যের দ্বাদশ সর্গের ১২ শ্লোক। এ সর্গের নাম সু-প্রীতপীতাম্বর। এর পূর্ব সর্গে জয়দেব লিখেছেন, মাধব শ্রীরাধার অভিমান ভাঙ্গিয়ে আর একটি নিভৃত কুঞ্জে শয্যা রচনা করে অপেক্ষা করছিলেন, এদিকে সখীরা শ্রীরাধার মন বুঝেই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সেই নিভৃতকুঞ্জে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষারত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা চলে গেলেন ; আর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হয়েছিলেন শ্রীরাধাকে বুকের কাছে পেতে। শ্রীরাধা যেই এলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাতা বিছানার দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—'এসেছ শ্রীমতি! এস এস, অনেক দূর থেকে এসেছো, আমি তোমার চরণসেবা করে দিই তুমি শয্যায় শুয়ে পড়। এর পর আরও বললেন এমন কতকগুলি কথা, যাতে নিভৃত কুঞ্জে যুবক যুবতীর সহজেই কামাবাদনে মন উদ্দীপ্ত হয়। তারপর আরম্ভ হল রতিরণ। এর বর্ণনা এত স্পষ্ট ভাষায় জয়দেব লিখেছেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবগণই হয়তো তাকে পবিত্র বলে স্মরণ করে ছিলেন, কিন্তু জয়দেব নিজেই তাকে 'কাম' বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—

জয়দেব বলেছেন—অমন করে রমণ করে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুখ পেয়েছেন। তাই বলি 'উঃ কামের আস্বাদনে যেমন ব্যথা, তেমনি সুখ, একেই বলে 'কামের বামাগতি' 'কান্তঃ কামপি তুপ্তিমাপতদহো কামস্য বামাগতিঃ'।

এর পর বিপরীত রতিরণ। অমনি জয়দেব মন্তব্য করলেন—

বক্ষো মীলিত মক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ?

আবার উভয়ে যখন একটু সময় চুপচাপ কাটাচ্ছেন সেইভাবে জড়াজড়ি করে রাধাকে বুকে রেখে তখন হরিভক্ত বৈষ্ণব কবি জয়দেব যেন তাই মানস-নেত্রে দেখতে দেখতে বলছেন—

মীলদৃষ্টি-মিলৎ-কপোল-পুলকং শীৎকার ধারা-বশা
দব্যক্তাকুল কেলি কাকু-বিকসৎ দন্তাংশু ধোতারম্।
খাসোন্নদ্ধ পয়োধরো পরি পরিষ্কঙ্গী কুরঙ্গী দৃশো।।
হর্ষোৎকর্ষ বিমুক্তি নিঃসহ-তনো-র্ধন্যো ধয়ত্যানগম্॥

এর পরই শ্রীরাধা দেখলেন তাঁর কেশদাম আলুলায়িত, শ্রীকৃষ্ণের দন্তাঘাতে নিজের অধর ওষ্ঠ দুটি সামান্য আহত, বুকের উপর গলার ফুলের মালাটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ খুব তৃপ্তি পেতে লাগলেন—

ব্যালোলঃ কেশপাশঃ তরলিত মলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টাধরশ্রীর কুচফলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ গতাশাং স্তনজঘন পদং পাণিনাচ্ছত্ত্বসদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপংমাং বিলুলিত স্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি॥

দ্বাদশ শতাব্দীর হরিভক্ত জয়দেব বুঝেছেন যুবক শ্রীহরি যুবতী শ্রীরাধার দেহে কামাকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হয়ে কোন এক কুঞ্জে অবস্থান করছেন, তাঁর অবস্থানটি কোথায় শ্রীরাধার সখীরা জানতেন, তাই শ্রীরাধাকে নিয়ে সেই কুঞ্জের দ্বারে গিয়ে তাঁকে উপদেশ দিলেন—

বিগলিত বসনং পরিহৃত রসনং ঘটয় জঘন মপি ধানম্
কিশলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধানম্।
হরি রাভমানী রজনিরিদানীং ইয়মপি যাতি বিরাময়।
কুরু মম বচনং সত্বর রচনং পূরয় মধুরিপ বসনম্ (৫/১৪ শ্লোক)

সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যটির প্রথম থেকে দ্বাদশ (৫।১৪ শ্লোক) সর্গ পর্যন্ত ২৮৫ শ্লোকের ভিতর প্রথম সর্গের ২৬টি শ্লোকে শ্রীহরির সঙ্গে শ্রীরাধার কাম কলার কোন বর্ণনা নেই। তারপর ঐ প্রথম সর্গের ২৭ শ্লোক থেকে সুরু করেছেন কামচর্চার উদ্দীপনা জাগান বসন্ত ঋতুর সমাগম।

শ্রীজয়দেব সেই শতাব্দীর বৈষ্ণবগণকে বুঝিয়েছেন শ্রীহরি প্রকৃতপক্ষে বহু নারীর সঙ্গে সঙ্গম করেও তৃপ্তি পেতেন না, একমাত্র রাধিকার অঙ্গ সঙ্গমের জন্যই তিনি লুব্ধ। তাই অন্য নারীর সঙ্গলাভ করেও তাঁর চোখ দুটি যখন ঢুলু ঢুলু তখনও তিনি রাধার অঙ্গ সঙ্গ কামনায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এটি একদিন বললেন কোন সখী শ্রীরাধাকে এবং দেখিয়ে দিলেন—

অনেক নারী পরিরম্ভ সংভ্রম
স্ফুরন্মনোহারি বিলাসলালসম।
মুরারিমারাৎ উপদর্শয়ন্ত্যসৌ
সখী সমক্ষর পুনরাহ রাধিকাম্ (১।৩৯)

প্রতিটি সর্গের শেষ শ্লোকে কিংবা মাঝে মাঝে জয়দেব বলেছেন, 'এমনি লীলাময় শ্রীহরি সকলের কল্যাণ বিধান করুন। তাছাড়া বলেছেন এমনি লীলায় মত্ত শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করে

কলি-পাতক জ্বরের তাপ দূর করুন সকলে, জয়দেব কবির রচিত গীতগোবিন্দ কাব্য এই জন্যই রচিত হলো—

শ্রীজয়দেব বচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে।
হরিচরণ স্মরণামৃত কৃত কলি কলুষ জ্বর খণ্ডনে॥

আজও একশ্রেণীর ভক্ত বা সাহিত্য-সাধক মনে করেন, বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কোষকাব্যে 'চিন্তামণির্জয়তি'-এর দ্বারা যেমন তাঁর ভাব ভাবসাধকা অথবা বৈরাগ্য সন্দীপনী কোন নায়িকার নাম ছিল চিন্তামণি, তাকেই চিরস্মরণীয়া করে রাখতে শব্দকৌশলে চিন্তামণি শব্দটি দ্ব্যর্থ করে কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তেমনি জয়দেবও তাঁর ভাবসঙ্গিনী বা দেহ-সঙ্গিনীর নাম 'পদ্মাবতী'কে গীতগোবিন্দ কাব্যে কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন যেমন— প্রথম স্বর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে 'বাগদেবতা চরিত চিত্রিত চিত্তসদ্মা, পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী' (১।২)।

'পদ্মাবতী-পয়োধর-তটী পরি রম্ভলগ্ন
কাশ্মীর-মুদ্রিত-মুরো মধুসূদনস্য। (১-২৬)

তারপর দশম সর্গের ৯ম শ্লোকে 'জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয় জয়দেব কবি এবং ১১ দশ সর্গের ২১ শ্লোকে 'বিহিত পদ্মাবতী সুখ সমাজে, কুরু মুরারে মঙ্গল শতানি ভণতি জয়দেব কবিরাজরাজে'। ইত্যাদি।

তাঁদের এ ধারণার মূলে জয়দেবেরই লেখনী-প্রসূত-স্মৃতিসন্ধানক 'পদ্মাবতী' শব্দ কিনা তা ৭।৮ শত বৎসরের ব্যবধানে হদিশ করা যায় না, কিন্তু যেখানে যেখানে তিনি আত্মপরিচয়ের সন্ধান সুলুক রেখে গিয়েছেন সেখানে কিন্তু পদ্মাবতী পতি জয়দেব এমন ইঙ্গিত দেন নাই। তৃতীয় সর্গের ১০ শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের রাধা-বিরহের অন্যতম উক্তি। সেখানে জয়দেব নিজের জন্মভূমি কেন্দুবিল্বগ্রাম এবং সে গ্রামটি যেন রোহিণী-নক্ষত্রের প্রিয়তম চন্দ্রমার উৎপত্তিস্থলী, সমুদ্রের মত, সেই সমুদ্রজাত কবি চন্দ্রমা জয়দেবই শ্রীহরির কন্দর্প বিরহের এই উক্তিগুলি করলেন—

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী রমণেন।

তাছাড়া গীতগোবিন্দের শেষ শ্লোকটিতেও অর্থাৎ শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামদেবী সুত শ্রীজয়দেবস্য এখানেও তিনি বসাতে পারতেন সামাজিক রীতিতে বিবাহিত জীবনের জীবন-সঙ্গিনী পদ্মাবতীর নাম। হয়তো পদ্মাবতী নামে কোন রমণী জয়দেবের জীবনে তৎকালে প্রচলিত সহজিয়া বৈষ্ণবীয় রীতিতে ভাবস্ফূর্তির অবলম্বনা ছিলেন, যেমন চণ্ডীদাস চরিত্রে রজক-রমণী রামীর নাম উল্লেখিত হয়।

এই গীতগোবিন্দ কাব্যটির বর্ণিত পরকীয়া রতি ও শৃঙ্গার রস সমৃদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু এটি ভগবত বর্ণিত কৃষ্ণলীলার অনুসরণে লিখিত হয় নাই। এটি লিখেছেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে। কারণ ভাগবতের কৃষ্ণ কোন ম্যাজিক দেখিয়ে ব্রজলীলার সঙ্গিনী গোপ-রমণীদের সঙ্গে এমন খোলাখুলি কামচর্চার কলা-কৌশল দেখান নি। গীতগোবিন্দ কাব্যের গোড়ার শ্লোকটিই তার প্রমাণ। জয়দেব সুরু করেছেন এইভাবে—

মেঘৈর্মেদুর মম্বরং বরভুবঃ শ্যামাস্তমাল-দ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরু রয়ং ত্বমেব তদিমং রাধো গৃহংপ্রাপায়।
ইত্থং নন্দনিদেশত শ্চলিতয়োঃ প্রত্যাধ্ব-কুঞ্জদ্রুমং
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥

অর্থাৎ মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, সারা বনের শ্যামল বনরাজি অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ ভয় পাচ্ছে, তার ওপর সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি এল, এখন একা যায় কি ক'রে বাড়ি, ওগো রাধে! তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পৌছে দাও; নন্দের এই কথাগুলি শুনেই রাধা সম্মত হলেন এবং যমুনার তীর ধরে আসতে আসতে প্রতি কুঞ্জে তাঁরা নিরিবিলিতে কেলি করতে লাগলেন। রাধামাধবের এই নিভৃত মিলনের জয় হোক্।

এই ধরণের কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা ভাগবতে নাই। এটি আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডের ১৫ অধ্যায়ে এবং তার জের টেনে ৮৪ অধ্যায়ে। ওখানকার কাহিনীটি এই ভাবে—'গোপ-বংশীয় নন্দ একদিন শিশু কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে ভাণ্ডার বনে গোচারণ করতে গিয়েছিলেন। তারপর বেলা যখন শেষ হয়, এমন সময় এক বৃক্ষমূলে এসে বসলেন। গোরুগুলি আসেপাশে চরছিল। এমন সময় কৃষ্ণ মায়া সৃজন ক'রলেন। হঠাৎ মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ; পরে এল বৃষ্টি। শিশুকৃষ্ণ খুব ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। এর পর এল ঝড়; আরও ভয় পেল কৃষ্ণ। নন্দও তাতে বেশ চিন্তিত হলেন। ইত্যবসরে নন্দ দেখলেন তাঁর প্রতিবেশিনী একটি যুবতী মেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। অপরূপ গঠন তার। নন্দ তাকে দেখে বিস্মিত হলেন আবার খুসীও হলেন। মনে পড়লো এর নামতো রাধা। এই মেয়েকেই তো আমাদের গর্গ পণ্ডিত বলেছেন এ হল হরিপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া। ভালই হল। আমার এই ভীরু শিশু-কৃষ্ণকে এরই সঙ্গে পাঠিয়ে দিই, ওই বাড়ি নিয়ে যাক্। এইটুকু ভেবেই রাধাকে সম্বোধন করে নন্দ বল্লেন—

গৃহাণ প্রাণনাথং চ গচ্ছ ভদ্রে যথা সুখম্।
পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রংকৃত্বা পূর্ণ মনোরথম্ ॥

অর্থাৎ ওগো কল্যাণি! এই আমার পুত্রকে নাও, এ তোমারই প্রাণনাথ। একে পথে নিয়ে যেতে মনোবাসনা পূর্ণ করে নিও।

নন্দ যখন এমনি ভাবে রাধাকে বলে কয়ে তার হাতে পুত্র কৃষ্ণকে সমর্পণ করছিলেন, কৃষ্ণ তখন ভয়ে কাঁদছিলেন। রাধাও নন্দের কথা শুনে তৃপ্তির হাসি হেসে শিশু কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন

ইত্যুক্তা প্রদদৌ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ ॥

রাধা শিশুটিকে নিয়ে এলেন নন্দের আদেশে। গভীর অরণ্যের পথে এবং প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একটু এগিয়েই রাধা শিশুটিকে বার বার চুম্বন আর সকাম হৃদয়ে অলিঙ্গন করতে লাগলেন, তাতেই উদ্দীপিত হলো লীলা রাসের আনন্দ—

এবং নন্দ নিদেশং চ শ্রুত্বা রাধা প্রিয়া সথা।
যমুনাতটে কুঞ্জধ্বং মযৌ মায়া ঘনাবৃতম্ ॥

কৃত্বা বক্ষসি তং কামং শ্লেষং শ্লেষং চুচুম্বচ।
পুল কাঙ্কিত সর্বাঙ্গী সম্মার রাস মণ্ডলম্ ॥

রাধার আলিঙ্গন এবং চুম্বন পেয়েই সেই বুকে রাখা শিশু কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ যুবকের রূপ ধারণ করলেন এবং যমুনার নিভৃত নিকুঞ্জ সমন্বিত পথে উভয়ে উভয়ের গোলকের রাস মণ্ডলের যাবতীয় কার্য্যাবলী স্মরণ ক'রতে করতে আবার এই মর্ত্যেই সেই রহঃকেলিতে মত্ত হলেন।

এতস্মিন্ অন্তরে কৃষ্ণং মায়া সদব্রহ্মরূপতঃ।
দদর্শ কমনীয়ঞ্চ কিশোর শ্যাম সুন্দরম্ ॥
কোটি কন্দর্প-লীলাভঃ প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
রূপং রাসেশ্বরী দৃষ্টা মুমোহ সুমনোহরম্।
ক্রোড়ং বালক শূন্যঞ্চ দৃষ্টাতং নব যৌবনম্ ॥
নবসংগম যোগ্যঞ্চ পশ্যন্তি বক্র চক্ষুষা ॥ ॥ ইত্যাদি—

অতএব জয়দেবের গীতগেবিন্দ কাব্যের প্রথম শ্লোকটি এবং পরবর্তী রাধাকৃষ্ণের লীলারস চর্চার বর্ণনাটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই সংগৃহীত। এই পুরাণটিকে পণ্ডিতগণ মনে করেন এটি রচিত হয় ৯ম থেকে ১১দশ শতকের মধ্যে।

ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট ধারণা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কী আক্রমণের পূর্বে এবং অষ্টম শতাব্দীর কিছু আগে থেকেই বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক বেশী রূপান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। যেটি বৌদ্ধসহজিয়া ধর্ম বা সহজযান নামে একটি অভিনব ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

এটি কখনও সহজিয়া শৈব (শঙ্কর শঙ্করীকে নিয়ে) কখনও বা সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম বলেই (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে) পরিগৃহীত হয়।

যাঁরা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মৌল ভিত্তি শূন্যবাদ, সেই শূন্যবাদেই প্রকৃত পুরুষের বিবর্দ্ধন কিংবা রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রবর্তন সাধিত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ এরা অদ্বৈত তত্ত্ব হয়েও দ্বৈতভাবে লীলা করে। এ লীলা জীবের দেহে অহরহ চলছে। ওই জন্যই বস্তুত পুরুষ নারী পৃথক দেহ হলেও মূলত তা অদ্বৈত তত্ত্ব। অদ্বৈত তত্ত্বটি আবার শূন্যে অবস্থান করে।

সহজিয়া শৈবগণও এমনি ভাবেই শিবদুর্গার লীলা কাহিনীকে তত্ত্বদৃষ্টিতে স্থাপন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণবগণের প্রভাব অনেকটা থর্ব হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পর শুদ্ধাভক্তিরসবাদী শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মটিকে কতকগুলি প্রখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত এমনভাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন যার নজীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে বহু স্থানে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথম নজীর শ্রীচৈতন্যদেব নাকি জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যটি আস্বাদন করতে করতে ভাবতন্ময় হয়ে যেতেন।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ (চৈঃ, চঃ | মধ্য | ১০ম)

দ্বিতীয় একদিন প্রভু যজ্ঞেশ্বর টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥

গুর্জরী রাগ লৈয়া সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ মোহনেরে॥ (অন্ত্য-১৩শ)

গীতগোবিন্দ কাব্যের গীতগুলির যেকয়টি রাগে গাইবার রীতি লিপিবদ্ধ আছে তাদের মধ্যে ১ম সর্গে একটি, দ্বিতীয়ে একটি, তৃতীয়ে একটি, পঞ্চমে ও সপ্তমে একটি করে গুর্জরী রাগের গান বেঁধেছেন জয়দেব। একমাত্র প্রথম সর্গের গানটিই শ্রিতকমালা কুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল, জয়জয়দেব হরে !…,এটি শ্রীহরিকে নানা ভাবের বিশেষণ বিশেষিত করে কুশল প্রার্থনা করা হয়েছে। তারপর বাকী গান গুলিতে যেভাবে শ্রীরাধা কৃষ্ণের কখনও বিরহ কখনও মিলন বর্ণনা করা হয়েছে সে গানগুলি শ্রীচৈতন্যদেব শুনতেন এমন ইঙ্গিত তাঁর জীবনদ্রষ্টাদের লেখা গ্রন্থগুলিতে নাই।

অথচ ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তা দেখা যায়। চরিতামৃতের যেখানেই শ্রীচৈতন্যদেব গীতগোবিন্দ গান শুনেছেন সেইখানেই স্বরূপের উপস্থিতিতে রাধাকৃষ্ণের রহঃলীলার আলাপন, কখনও বা রামানন্দ রায়ের সঙ্গে ঐ আলাপন বা সঙ্গীত শুনতেন

স্বরূপ গোঁসাই তবে মধুর করিয়া।
গীত গোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥ চৈঃ, চঃ | অন্ত্য
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥ চৈঃ, চঃ | অন্ত্য

গীতগোবিন্দের প্রসঙ্গগুলি শুনতেন তখন যখনই শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ প্রলাপ শুনতে পেতেন তাঁরা। আবার ভাবোন্মাদ শান্ত হলেও শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপের মুখে বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীতি কাব্যের গান শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন

ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীত গোবিন্দ গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এইসব দৃষ্টান্তের স্থল দেখেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটিকে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের একটি আস্বাদ্য গ্রন্থ বলে ধারণা পোষণ করে আসছেন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান অথবা অলংকার শাস্ত্রের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসবাদের তুলনা না করেই সিদ্ধান্ত করেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে অপরিহার্য্য ভক্তিরস বাদী গ্রন্থ।

কথাটা এই, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'লো—ভারতের সুপ্রাচীন অলংকারিকগণ তাঁদের অলংকার গ্রন্থগুলিতে প্রায় সকলেই 'শান্তকে রস বলে স্বীকার করেছেন, এমন কি দশম শতাব্দীতেও শান্ত রসকেই প্রধান রস বলে গণ্য করেছেন, নাট্যশাস্ত্রে ভরতও শান্তকে 'প্রকৃতি রস' বলে প্রতিপন্ন করেছেন, (প্রাকৃত রস) এমন কি তাঁর পরবর্তি কালের ও অলংকারিকগণ শান্তকে রস বলেছেন, কোন জায়গাতেই ভক্তিকে রস বলেন নাই। সকলেই বলেছেন ভক্তি হলো ভাব বা চিত্তের একটি বিক্রিয়া মাত্র। অগ্নিপুরাণ নবম শতাব্দীর গ্রন্থ,

সেখানেও ভক্তি মানে চিত্তের ভাব মাত্র অথচ রস স্বরূপতঃ অলৌকিক একথা সকলেই বলেছেন' কিন্তু সেই রসের মধ্যে ভক্তির যে একটি অলৌকিক রস কেউ তা বলেন নি।

তৃতীয় শতাব্দীর ভরত ব'লেছেন—

শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ-রসাঃ……।

আর মম্মট ভট্ট বলেছেন দেবাদি বিষয়ক রতিটির নাম ভাব

রতি র্দেবাদি বিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ
ভাবঃ প্রোক্তাঃ,… … … … ……'

ভারতের শেষ আলংকারিক সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ ও রস গঙ্গাধর প্রণেতা জগন্নাথ। এরাও স্বীকার করেন নাই ভক্তি কোন রস। ওঁরা বলেছেন ভক্তি একটি ভাব। জগন্নাথ জেনেও ভক্তিকে রস বলেন নাই, বলেছেন ওটি একটি ভাবেরই অন্তর্গত, এবিষয়ে নিজেই পূর্ব পক্ষ করেছেন—

'অথ কথমেত এব রসাঃ ? ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিঃ
অনুভবস্য হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ সময়ে ভগবদ্ভক্তৈঃ
অনুভূয়মানস্য ভক্তি রসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদ পুরাণ রূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়ীভাবঃ।
ন চাসৌ শান্তরসে অন্তর্ভাব মর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্য বিরুদ্ধাত্বাৎ উচ্যতে—
ভক্তে র্দৈবাদি বিষয়রতিস্তেন ভাবান্তর্গততয়া রসাত্মনুপত্তিঃ ইতি।

অর্থাৎ এই কয়টি মাত্র রস ? সে কি হয় ? ভগবান যার আবলম্বন, রোমাঞ্চ অশ্রুপাত যার অনুভাব, হর্ষাদি যার পোষক, ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ যার উদ্দীপন এমন ভগবদভক্তজন অনুভূয় মান ভক্তিকে কি করে রস না বলা যায় ? ভক্তিকে তো শান্ত রসের অন্তর্ভুক্ত করাও যায় না, কারণ অনুরাগ তো বৈরাগ্যের বিরোধী ভাব, সুতরাং ভক্তিকে স্বতন্ত্র রস বলে স্বীকার করতে আপত্তি কোথায় ? জগন্নাথ বলেছেন হ্যাঁ আপত্তি খুবই—কারণ দেবাদি বিষয়ে অনুরাগ বা ভাবটিতো ভাবের অন্তর্ভুক্ত, রস কি করে হয় ?

শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগামী শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রতিভাশালী পুরুষ ও অসাধারণ প্রতিভাশালী শ্রীচৈতন্যের মানসপুত্র বৈদ্যসন্তান মহাকবি কর্ণপুর তাঁদের গ্রন্থে পূর্বাচার্যদের এই মতবাদকে খণ্ডন করে বলেছেন—ভাব হল লৌকিক, কেবল রসের ব্যঞ্জক বলেই অলৌকিক, কিন্তু ভাগবতী আনন্দ চিন্ময়সত্বা রূপে ভক্তিরস লোকালোক সত্বায় সর্বদাই অলৌকিক এবং রসসত্বায় বিরাজমান। রস দ্বিনিষ্ঠ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যখন প্রাকৃত নায়কনিষ্ঠ, তখন সে রস প্রাকৃত। আর শ্রীগোবিন্দ, রাম প্রভৃতি অপ্রাকৃত নায়কনিষ্ঠ তখন অপ্রাকৃত। ভক্তিরসের নায়কও অপ্রাকৃত।

ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা ভক্তির রসবাদিতা স্থাপন ক'রেছেন। একথা কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্বে এই ভারতের কোন প্রদেশের কোন আলংকারিকই দেখাতে পারেন নাই।

অতএব গীতগোবিন্দের রচয়িতা দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের আমলেও ভক্তির ভাবত্বই ছিল, ভক্তির রসময়ত্ব খ্যাপন ছিলই না। সেক্ষেত্রে 'স্মরগরল খণ্ডনং এবং দেহিপদ-পল্লব মুদারম্' এগুলি ভক্তিরসবাদীর লেখাই নয়। ভক্তিভাববাদির লেখা। ও ভাবটির অন্তঃশক্তি অপ্রাকৃত রসের সঞ্চার

করে না। করে প্রাকৃত ভাবের।

এই বিচারের ধারা দিয়ে যারা বিচার করবেন তাঁদের কাছে খুব স্পষ্ট হবে যে শ্রীহরিকে দিয়ে জয়দেবের গীতি কাব্যটির একটি শ্লোকের অসমাপ্ত চরণের পাদপূরণ করার জন্য জয়দেবের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং পদ্মাবতী নামে কোন রমণীকে জয়দেবের জীবন-সাধনায় একান্ত বল্লভা করে চিহ্নিত করার পিছনে কোন্ ধরণের ভক্তকৃতি প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে।

বাংলার সহজ বৈষ্ণবদের যে ধারাটি আজও নিরন্তর কাজ করে চলেছে, তাঁদের সে ধারাটিই যে লোকগীতি, পল্লীগীতি, বাউলগীতির মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের গোপন পরকীয়া রতির উল্লাস জাগিয়ে চলেছে তারও পিছনে রয়েছে প্রাকৃত ভাবের ভিত্তিতে রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্য। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের বাংলা গীতিকাব্যগুলিও আলংকারিকদের নিখুঁত রসচর্চার নিদর্শন হয়েও, ওসব কাব্যের রচয়িতাদের কৃষ্ণ-রাধার পরকীয়া রতিটি প্রাকৃত ভাবময়, কিন্তু ভক্তি রসময় নয়, কারণ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কোন দার্শনিক যুক্তির দ্বারা অলংকার বিজ্ঞানে ভক্তিকে অপ্রাকৃত রস ব'লে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি।

লোকসংস্কৃতির নৃবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা

রেবতীমোহন সরকার

লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর বিষয়ে আলোচনার প্রবণতা সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ফোকলোরের সর্বভারতীয় প্রতিশব্দ চয়নে যদিও বিদগ্ধ পণ্ডিতমহলে তর্কের শেষ নেই তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মানব জীবন পর্যালোচনা এবং সুসমৃদ্ধ আলোচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহারের উপকারিতায় সকলে একই মত পোষণ করেন। লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহের আলোচনা ধারা যদিও বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত তবুও সেই ধারা সমূহ একই লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা লোকসংস্কৃতির বিশেষ ধারার বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব এবং তা হল লোকসংস্কৃতির নৃবিজ্ঞানভিত্তিক ধারা। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির কথা আলোচনা, মানুষের সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য আর নানান কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ। মোটকথা সমাজজীবন চর্চার একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, বাস্তবধর্মী পথকে যুক্তি ও তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে আলোকিত করাই নৃবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি অনেকাংশে এই ভাবধারায় রূপায়িত। মানুষের মনের গতিবিধির সন্ধান লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহে প্রতিফলিত। মনের এই গতিশীলতাই মানুষকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠাদান করেছে—মানুষ নিজেকে প্রকৃত সামাজিক জীব হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এই গতিশীলতার স্বরূপ সন্ধানে মানুষের রীতি নীতি, আচার-আচরণ, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির ভৌগোলিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরাও নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রধান কাজ। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লোকসংস্কৃতি খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্যতম এবং অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিণত হয়। এই কারণেই তৎকালীন নৃবিজ্ঞানীগণ মানুষের সমাজ সভ্যতার বিভিন্ন ধারার আলোচনায় ব্যাপকভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহের ব্যবহার করেছিলেন। ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বুকেও আমরা এধরনের প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভব করি। তবে তা এসেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন নৃবিজ্ঞানীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ইউরোপ-আমরিকার নৃবিজ্ঞান ভিত্তিক লোকসংস্কৃতির বিকাশ পরিস্ফুটনের পাশাপাশি ভারতে লোকসংস্কৃতি চর্চার শুরু এবং নৃবিজ্ঞান ভিত্তিকতার বিষয়ে যথাযোগ্য আলোকসম্পাতের চেষ্টা করব।

লোক সংস্কৃতি চর্চাকে নৃবিজ্ঞানের চত্বরে যথাযোগ্য স্থানদান এবং মানব সমাজের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণে পথিকৃৎ হলেন প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টাইলর। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুস্তক প্রনয়ণ করে তাতে তিনি মানব সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার আলোচনায় বিশ্বাস, সংস্কার এবং রীতি নীতির প্রতি যথেষ্ট আলোক সম্পাত করেছিলেন। (১) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অপর এক পুস্তকের মাধ্যমে তিনি পূর্বোক্ত দৃষ্টি ভঙ্গির পক্ষে আরও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করলেন। (২) ইতিমধ্যে উইলিয়ম থম সর্বজনীন শব্দ ফোকলোর কথাটির উদ্ভাবন করেছেন এবং বহুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ পপুলার এন্টিকুইটিস

কথাটির স্থলে ফোকলোরের ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত হয়। প্রখ্যাত মানববিজ্ঞানী অ্যাক্স ল্যাং এইসময়েই তাঁর মানব সমাজ ভিত্তিক গবেষণার লোক সংস্কৃতির উপাদান সমূহের প্রাধান্য স্বীকার করে ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের তিনি পৌরানিক উপকথা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্বাস ও সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের গতি প্রকৃতির আলোচনা করেন। তারপর বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে এই একই ধারার আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান অনুশীলনের চত্বরে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মূল্যায়নের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। (৩) এই সকল সমালোচনায় যখন পণ্ডিত মহলে নানা চিন্তার সূচনা করেছিল ঠিক সেই সময়ে (১৮৭৮ খ্রী) লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোকলোর সোসাইটি অব্ লণ্ডন। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র ফোকলোর রেকর্ডস্ নামে প্রকাশিত হয়—পরে ঐটি ফোকলোর জার্নাল এবং শেষে ফোকলোর নামে পরিচিতি লাভ করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পত্রিকায় ইউরোপীয় সমাজের সাধারণ মানুষের বা জনগণের কথা বলার চেষ্টা করা হয়—তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়। ইউরোপীয় রাজারাজড়াদের গৌরবময় কীর্তিকাহিনীর পাশে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কর্মধারা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সাধারণ মানুষও তাদের নিজস্ব ও সংস্কারের মূলে পৌঁছতে এবং ওল্ডগের বিশ্লেষণের ফলাফল জানতে আগ্রহান্বিত হয়।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক জে. জি. ফ্রেজার ব্যক্তিগতভাবে ফোকলোর সোসাইটি অব লণ্ডন-এর কর্মধারায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা অংশের লোকবিশ্বাস, যাদুবিদ্যা ও লোকধর্মের নানা উপাদান ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তিনি বিশ্বমানব সমাজ ব্যবস্থার ধারার প্রতি আলোক সম্পাত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এর নাম হল The Golden Bough. আক্ষরিক অর্থে এটি হল বৃক্ষের স্বর্ণ শাখা। মানব সমাজকে ফ্রেজার একটি স্বর্ণ মহীরুহ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারই একটি স্বর্ণ শাখা হল মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস সংস্কার-কুসংস্কার সমন্বিত আলোচনা। মানুষের সমাজ ব্যবস্থার ধারার প্রতি আলোক সম্পাতে এই সকল ধ্যান ধারণার যে সর্বাধিক মূল্য রয়েছে তা তিনি এই পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছেন।

এর পর নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং মানব সমাজের নানা বিষয়ের প্রতি আলোকসম্পাতে লোকসংস্কৃতিকে যিনি সবচেয়ে বেশী কাজে লাগিয়ে ছিলেন তাঁর নাম হল ফ্রেন্জ বোয়া। ইনি একজন প্রখ্যাত আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী। নৃবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রতি তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের জীবনচর্চা এবং অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনাদর্শের প্রত্যক্ষ চিত্র পরিস্ফুটনের সময় ফ্রেন্জ বোয়া লোকসংস্কৃতির উপাদানের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির মুখপত্র জার্ণাল অব আমেরিকান ফোকলোর নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেন্জ বোয়া উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের জীবনভিত্তিক একটি প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতি উপজাতির মধ্যে লোকগাথার পরিব্যাপ্তির দিকটির প্রতি বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেন। প্রবন্ধটি জার্ণাল অব আমেরিকান ফোকলোর-এ প্রকাশিত হয়। (৪) এর পর মানবসমাজের ধারা বিশ্লেষণে লোকসংস্কৃতির

গুরুত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে জার্ণাল অব ফোকলোর-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধ অতিশয় মূল্যবান। (৫) ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বছর ফ্রেন্জ বোয়া জার্ণাল অব আমেরিকান ফোকলোর সম্পাদন করেন এবং এই সময় আমেরিকায় লোকসংস্কৃতিবিদ এবং নৃবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার মধ্যে এক আত্মিক যোগসূত্র গড়ে উঠে। ফ্রেন্জ বোয়া সম্পাদিত জেনারেল এ্যানথ্রোপলজি নামে বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা সমন্বিত পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন, Every manfestation of human life must be utilised to clear up the march of historical event? এই ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফ্রেন্জ বোয়া লোকসংস্কৃতিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে আমেরিকায় নৃবিজ্ঞানভিত্তিক লোকসংস্কৃতি আলোচনার রূপকার হলেন ফ্রেন্জ বোয়া।

ফ্রেন্জবোয়ার এই বিশেষ কর্মপদ্ধতি তাঁর যোগ্য শিষ্য ও শিষ্য যথাক্রমে রুথ বেগডিক্ট এবং এম, জে, হার্সকোভিটস এর সাহায্যে আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হতে থাকে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রুথ বেনেডিকট জার্ণাল অব আমেরিকান ফোকলোর-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। জুলি উপজাতির জীবনাদর্শের উপর রচিত তাঁর পুস্তক (৬) নৃবিজ্ঞানভিত্তিক লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। হার্সকোভিটস তাঁর বিভিন্ন মানবসমাজ ভিত্তিক আলোচনায় লোককথা, কাহিনী, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'a substantial body of folklore is more than the literary expression of a people.' এই ফোকলোরকে সুসমঞ্জসভাবে ব্যাখ্যা করলে মানব-জীবনধারার বিশেষ দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই সকল আলোচনাধারায় প্রভাবিত হয়ে প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, বি, ম্যালিনস্কি ট্রবিয়্যাণ্ড দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের জীবনচর্যার আলোচনায় রূপকথা, লৌকিক উপাখ্যান এবং পৌরাণিক কথার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।(৭) সমাজের ধারা নিয়ন্ত্রণে লোকগাথা ও গীতিকা কিভাবে কাজ করে সেই সূত্র উদ্‌ঘাটনে ম্যালিনস্কি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মানব সমাজ-সংস্কৃতির পর্যালোচনায় লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক ব্যবহারে টাইলর-ফ্রেজার-বোয়া বেনিডিক্ট-ম্যালিনস্কি প্রদর্শিত এই পথটির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হতে থাকে। আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীরা সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়লেন। কালক্রমে নৃবিজ্ঞান এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবধান দেখা দিল। কিছুদিন পর নৃবিজ্ঞানী এবং লোকসংস্কৃতিবিদদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ব্যবধান দূরীভূত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হার্সকোভিটস জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর-এ Folklore after a hundred years (৮) a problem of redefinitions শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজ-সংস্কৃতির পটভূমিকায় লোক-সংস্কৃতির নবোন্মেষের প্রতি বিস্তৃত আলোকসম্পাত করলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ উইলিয়ম ব্যাসকম্ লোকসংস্কৃতি এবং নৃবিজ্ঞানের সুপ্রাচীন সম্পর্ক ধারাটি ফিরিয়ে আনার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। মানব সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার পর্যালোচনা এবং অনুশীলনে লোকসংস্কৃতির রূপক ব্যবহারের গুরুত্ব বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। অপরদিকে প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী এ, এল, কোবার-এর

সম্পাদনায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের রচনা নিয়ে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যানথ্রোপলজি টু ডে নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রখ্যাত আমেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদ স্টিথ থমসন এ্যাডভানসেস্ ইন্ আমেরিকান ফোকলোর নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতি এবং নৃবিজ্ঞানের আত্মিক যোগসূত্র বিষয়টি নানা উদাহরণের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করা হয়। (৮) এ ছাড়া স্টিথ থমসন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বি জোনস-এর সহযোগীতায় মোটিফ ইনডেক্স ইন্ ফোক লিটারেচার নামধারী এই পুস্তক ছয়টি খণ্ডে সমাপ্ত এবং এতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা লোককথা, গীতিকা ও লোকসাহিত্যের প্রাথমিক উপাদানগুলির সুসমঞ্জস বিন্যাস ও আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের সামাজিক ঐতিহ্যের ধারা অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ভারতে এদের কর্মপ্রচেষ্টাও রূপায়িত হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি এবং আমেরিকান এ্যানথ্রোপলজিক্যাল এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে যে আলোচনার আসর বসে তাতে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের এক বিস্তৃত দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়। এই আলোচনা আসরের বিভিন্ন আলোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। (৯)

যাই হোক লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের বিশ্লেষণ এবং তার মাধ্যমে মানব সংস্কৃতির রূপ উদ্ঘাটনে আমেরিকার একদল নৃবিজ্ঞানীর এই প্রচেষ্টা বহু পণ্ডিতকে আকৃষ্ট করেছিল। এদের মধ্যে হারবার্ট হ্যালপার্ট, অ্যালেন লোম্যাক্স, এডওয়ার্ড লিচ প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী না হয়েও এঁরা লোক সংস্কৃতি গবেষণা ও আলোচনায় নৃবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি রচনার পক্ষে সুচিন্তিত মতামত দান করেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাস ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি বিশারদ আর, এম, ডরসন লোকসংস্কৃতির আলোচনায় নৃবিজ্ঞানের অপরিহার্য প্রভাবের কথা সকল সময়েই স্বীকার করেছেন এবং এদিকে সকল ক্ষেত্রের পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আজকের আমেরিকার লোকসংস্কৃতি গবেষণা এবং অনুশীলনের প্রবাহমান ধারায় নৃবিজ্ঞানের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান নৃবিজ্ঞানে রূপায়িত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কর্মকুশলতায় লোকসংস্কৃতির নিরীমি দিগন্তে নৃবিজ্ঞান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত, আলোচনা প্রধানতঃ ভারততত্ত্বের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কালক্রমে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এদেশের ধর্ম, সমাজ, লোককথা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে এদেশের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারার আলোচনা করেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির আলোচনা উদ্দীপনা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র জার্নাল অব দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল (প্রথম প্রকাশ ১৭৮৪)-এর পৃষ্ঠায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হতে থাকে। ১৮০৪খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে এ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অব বম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের লোক-সংস্কৃতির সংগ্রহের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান এবং প্রকাশনার বিষয়ে এই সংস্থার অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ্ জেমস্ বার্জেস্ এর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ভারতের এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম লোকসংস্কৃতিকে বিশেষ যত্নের সাথে প্রকাশ করা হয়। এই সব পত্রিকা ব্যতীত যে পত্রিকাগুলি ভারতে লোকসংস্কৃতির আলোচনা বিষয়ক ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি হল দি ক্যালকাটা রিভিউ (১৮৯০), দি মডার্ন রিভিউ (১৯০৭), জার্নাল অফ্ মাইথিক সোসাইটি ব্যাঙ্গালোর (১৯০৯), জার্নাল অফ্ বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি (১৯১৫)' মান ইন্ ইণ্ডিয়া (১৯২১) জার্নাল অফ্ এ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি (১৯৩৮), দি ইস্টার্ণ এ্যানথ্রোপলজিস্ট (১৯৪৭), বঙ্গভাষী (১৯৫২), ফোকলোর (১৯৫২), জার্নাল অফ্ সোস্যাল রিসার্চ (১৯৫৮)। মুখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে এগুলি অন্যতম। এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির নানা বিষয় প্রকাশ করতে থাকে। বাংলা পত্রিকার মধ্যে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে সমকালীন, অমৃত, কৌশিকী, লোকসংস্কৃতি প্রধান।

ভারত ভূমিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার বিচিত্র জাতি-উপজাতি আধ্যুষিত ভারতের সমাজ ব্যবস্থার এক সার্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করে। সেই প্রয়োজন মেটাতে প্রথমে বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার এবং পরে ইউরোপ হতে সরাসরিভাবে বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের এদেশের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনার জন্য আনা হল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জে, এ, দুবয় রচিত 'হিন্দু ম্যানারস্' কাষ্টমস্ সেরিমেনিস্' নামক প্রখ্যাত পুস্তকে লোক সংস্কৃতির সংগ্রহ এবং বিন্যাসের প্রতি আলোক সম্পাত করা হয়। এই প্রসঙ্গে আর, সি, টেম্পল্ এবং ডব্লিউ, ক্রুক এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু'জন যথাক্রমে পাঞ্জাব নোটস্ এ্যাণ্ড কোয়ারিজ এবং নর্থ ইণ্ডিয়ান নোটস এ্যাণ্ড কোয়ারিজ নামক পত্রিকা দু'টির সম্পাদক ছিলেন। এঁদের প্রচেষ্টার ঐ পত্রিকা দুটির পৃষ্ঠায় ভারতের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় উদ্ঘাটিত হয়।

ভারতের উপজাতীয় লোকসংস্কৃতি এবং অন্যান্য গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ এবং বিন্যাসে যাদের নাম অমর হয়ে আছে তাঁরা হলেন জে, ফাগুসন; জেডি অ্যাণ্ডারসন; এম, এ, শেরিং; এইচ, এইচ, রিস্‌লে; ই, এ, গেট; ই, টি, ড্যালটন; ডব্লিউ, জি, আর্চার; সি, এইচ, বম্পাস; এল, এস, এস, ও ম্যালি, থার্সটন প্রভৃতি। এদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতি-উপজাতি ভিত্তিক এবং অঞ্চল ভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতির অধ্যয়নের এক বিশেষ দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির প্রকরণগ্রন্থে লোকাচার, লোককথা, লোক কাহিনী ও লোক বিশ্বাসের আলোচনা গুরুত্ব লাভ করে।

বিদেশী পণ্ডিতদের এই কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে লোক সংস্কৃতির আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ নিজেদের নিয়োজিত করেন। বহু ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ শুরু করেন। দেশবাসীকে এদের মূল্যায়ণে প্ররোচিত করেন। যারা লোক সংস্কৃতির আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন লাল বিহারী দে,

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, শরৎচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। লাল বিহারী দে মহাশয়ের ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি লোককথা ও কাহিনী বিষয়ে এক অনবদ্য রচনা। দীনেশচন্দ্র সেন রচিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ভারতীয় লোকসাহিত্য ও গীতিকা গবেষণার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। গুরুসদয় দত্ত বাংলা লোকশিল্প কলা এবং লোকনৃত্যের প্রতি বহু প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র মিত্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে গবেষণার ভিত্তিতে বহু লোকগাথা ছড়া' প্রবচন, বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি সংগ্রহ করেছিলেন যা আজকের লোকসংস্কৃতি গবেষকদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

লোকসংস্কৃতির এই সংগ্রহ এবং আলোচনা তদানীন্তন বহু দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথও লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। লোকসংস্কৃতির পুঁথিগত দিকটি পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষদের সাথে মিলে মিশে তাদের মধ্য হতে লোকসংস্কৃতির রত্নরাজি উদ্ধারে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বিদেশী পণ্ডিতদের ভারতীয় মনীষীগণ যখন তাঁদের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও আলোচনায় সারা দেশব্যাপী বিদ্বজ্জন সমাজে আলোড়ন আনতে শুরু করলেন ঠিক সেই সময়ে একজন ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপরিহার্যরূপে গণ্য করলেন। এই নৃবিজ্ঞানীর নাম হল শরৎচন্দ্র রায়। ইনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে ভারতের নৃবিজ্ঞানের ধারার সাথে লোকসংস্কৃতির ধারার মহামিলন ঘটিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রায় প্রধানতঃ ফোকলোর সোসাইটি অব্ লণ্ডন এর তদানীন্তন সভাপতি অ্যাণ্ড্রু ল্যাং এর কর্ম প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে তিনি বলেছিলেন লোকসংস্কৃতিই হল সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি আলোচনার গুরুত্ব এবং কিভাবে একে সমাজ বিজ্ঞানীদের সমাজ জীবনের ধারা বিশ্লেষণের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায় তার পথ নির্দেশ করেন। সারাজীবন ধরে শরৎচন্দ্র রায় উপজাতীয় লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ এবং আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার প্রকাশ শুরু করে ভারতে নৃবিজ্ঞান ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি আলোচনায় এক বিস্তীর্ণ সুযোগের সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্র মনে করতেন লোকসংস্কৃতির উপাদানের সাহায্যে মানুষের মনের গভীরে যেমন প্রবেশ করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে অথবা এর সাহায্যে মানব জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে প্রবেশ করতে পারি। সমসাময়িক বহু নৃবিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ভেরিয়র এলুইন কর্তৃক সংকলিত 'ফোক সংগস্ অফ্ ছত্রিশ গড়' এবং বিহার আসাম, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় সংস্কৃতির বিবরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এস. সি. দুবে রচিত 'ফিল্ড সংগস্ অফ্ ছত্রিশ গড়' একটি সমরূপ কাজের নমুনা। এ ছাড়া বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী কর্তৃক রচিত উপজাতীয় প্রকরণ গ্রন্থ গুলোতে লোকসঙ্গীত ও লোককথা এবং কাহিনীর বিস্তৃত অধ্যায় সংযোজন এই সময়ে একটি বিশেষ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তৎকালে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত লোক সংগীত, ছড়া, প্রবচন,

লোককথাগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব সমাজদর্শনের বিভিন্ন গতি প্রকৃতি উদ্ঘাটনের কোন প্রবণতা দেখা যায় নি। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাজদর্শন পর্ব সমাধা হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজকে অগ্রণী ও বহুল প্রচারিত নৃবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকাগুলিতে লোকসংস্কৃতির আলোচনা যদিও উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম হিসেব স্বীকৃত তবুও প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে নৃবিজ্ঞানভিত্তিক লোকসংস্কৃতি আলোচনায় এগুলি আগ্রহহীন। এর একমাত্র কারণ হল বর্তমান নৃবিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় অনীহা। অথচ এই বিশেষ দিকটির প্রতি অনীহা থাকলে ভারতীয় জনসমাজের অভ্যন্তরে কোন দিনই প্রবেশ করা যাবে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে একটু প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ভারতীয় নৃবিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং গবেষণায় গ্রামসমীক্ষার প্রবণতা দেখা দেয়। আমেরিকার ও ভারতের বহু নৃবিজ্ঞানী পৃথক পৃথক ভাবে ভারতের বহুগ্রামে তথ্য ও তত্ত্বমূলক বিবরণ দান করেন। ভারতের গ্রামজীবন আলোচনাকালে এঁরা সমাজ জীবন, রাজনীতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন। জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে চুলচেরা বিচার করেছেন। গ্রাম সমীক্ষামূলক গ্রন্থগুলিতে এর পরই হয়ত দেখা যাবে একটি বা একাধিক অধ্যায় যেখানে গ্রামীন ছড়া, প্রবচন, লোকগীতি লোককথা ও কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রামাজীবনের নানা গতি প্রকৃতি দর্শনের কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি।

ভারতীয় গ্রাম ও সমাজ পর্যালোচনায় মনে রাখতে হবে যে এই গাথা গীতিকা গুলিই গ্রাম জীবনের প্রাণময় ছন্দ স্বরূপ। গ্রামীন জীবন দর্শনের প্রকৃতরূপ লুকিয়ে রয়েছে এগুলির মধ্যে। এগুলির মূল্যবোধের জন্যে কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিগুলির সার্থক প্রয়োগ যথেষ্ট নয়—এরজন্য চাই সূক্ষ্ম অনুভূতি। মূলতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অনুসরণ করেই ভারতীয় গ্রাম সমীক্ষার ধারা ভারতীয় বিজ্ঞান মহলে প্রচারিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব নেই ঠিকই কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে পাশ্চাত্য সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন যাপন করে এদের পক্ষে স্বল্প সময়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁদের পক্ষে গ্রামীন ছড়া, প্রবচন, লোকগীতির প্রকৃত মূল্যায়ণ সম্ভব হয় না। খুবই পরিতাপের বিষয় যে আমরা ভারতীয় সমাজে লালিত পালিত নৃবিজ্ঞানীরা এই পশ্চিমী ধারাটি সযত্নে রক্ষা করে চলেছি। সমাজদর্শনে জনজীবনের কেন্দ্র বিন্দুটিকে উপেক্ষা করে চলেছি।

গ্রামবাংলায় যাঁরা ঘুরেছেন, গ্রামীণ জীবনে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, গ্রামীণ ভাবধারার সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে নিজেদের জড়িয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে গ্রামের জীবনদর্শন ছড়া, প্রবচন লোকগাথায় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত। পারস্পরিক সম্পর্ক জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, পারিবারিক জীবনে ধর্ম, রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ছড়া, প্রবচনের প্রাচুর্য দেখা যায়। এগুলির মধ্যেই গ্রামের জীবনচর্চা প্রতিফলিত। সেই বর্গী এল দেশের মত প্রখ্যাত ও সুপরিব্যাপ্ত ছড়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাবলীও গ্রামবাংলার জীবনে ছড়ার রূপ নিয়েছে। বীরভূমের গ্রাম থেকে এমনিই অসংখ্য ছড়ার মধ্যে থেকে একটি উদ্ধৃত করি—

গিন্নি ভাঙ্গলে জার
কর প্রাচীর পার
বিটি ভাঙ্গলে কাঁসি
পড়ে গেল হাসি
বৌ ভাঙ্গলে সরা
গিন্নি বেড়ায় পাড়া পাড়া। (১০)

এই ছড়ার মধ্যেই গ্রামবাংলার প্রাচীন দিনের শাশুড়ি, বৌ এবং মেয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক রূপায়িত হয়। সমাজের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই ছড়াটির মূল্যও তাই ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং একেই ভিত্তি করে জন্ম নেবে নতুন ছড়া। সামাজিক ভাবাধারার পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি আলোচনায় প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন ছড়াগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে সাহায্য করবে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় লালিত পালিত কোন নৃবিজ্ঞানীকে এই ছড়ার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে বহু সাধনা করতে হবে—অথচ আমরা অতি সহজেই এটা করতে পারি। কোন গ্রাম সমীক্ষাকালে আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ, সংক্রান্ত কতকগুলি সুদৃঢ় এবং ঐতিহ্য প্রভাবিত নিয়মকানুনের বর্ণনা দিলেই গ্রামজীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠে না। এই বর্ণনায় গ্রামীণ মানুষের বাহ্যিক দিকটিই পরিস্ফুট হয়—অন্তরের বার্তা এতেপ্রকটিত হয় না। লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবচন সংগ্রহ এবং আলোচনাকালে গ্রামীণ সংস্কার ও বিশ্বাসের মূল্যও দিতে হবে।

গ্রামজীবনের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় আমরা গ্রামের পাশের ন্যাড়া বেলগাছটার কথা ভুলে যাই। সেখানে থাকেন ব্রহ্মদৈত্য—গ্রামের মানুষ কোন অনুষ্ঠান না করলেও আসা যাওয়ার পথে একবার তার উদ্দেশ্যে মাথাটা ঝুঁকিয়ে নেয়। অথবা আমরা ভুলে যাই মাঠের মাঝে সেই ছায়া ঘেরা তালপুকুরের কথা। সেখানের নিঃস্তব্ধ পরিবেশ, সন্‌সনে হাওয়া আর পত্র মর্মর এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। বাল্যকাল হতে শুরু করে বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের ছেলে মেয়ে ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকায় সেই তালপুকুরের দিকে আর মনের মাঝে জমা হয় তাকে এড়িয়ে যাওয়ার আকুতি। কতই গল্প রচিত হয় সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ঘিরে। সেই গল্পে ছোটরা ভয় পায়—বড়রা হাসে। মানুষ এবং তার কর্মপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় জড় পদার্থের মত সেগুলিকে কেবল মাপের মধ্যে আনলেই হবে না—তার মনের পরিচয় না পেলে কর্মকাণ্ডের যথার্থ পরিচয় মিলবে না।

---

(১) Researches into the early history of mankind (1865). (২) Primitive culture (1871), (৩) Mythology and Fairy tales (1873), Myth, ritual and religion (1887), (৪) Dissemination of tales among the

natives of North America' (1891), (৫) (i) The Growth of Indian Mythologioies, (ii) The folklore of the Eskimos (iii) Mythology and folkltales North American Indians, (iv) Romance Folklore among American Indians, (v) Kwakuti culture as reflected in mythology (৬) Zuni mythology (1931), (৭) myth in primitive psychology (1926), (৮) 'Folklore and anthropology have always had so intimate and well recognised a relationship that it is not possible to draw exact boundaries between them' (৯) Traditional India—structure and change, ed. by Robort Redfield and Millon singer (1958), (১০) শ্রীঅজিতকুমার মিত্রের সংগৃহীত ছড়া—গাধা গীতিকায় চিরন্তনী বাংলা।

লিপি-ফলকে বাঙালীর কাব্যচিন্তা

ত্রিপুরা বসু

প্রাকৃতিক সম্পদ আর সৌন্দর্যে ভরপুর বঙ্গদেশের মানুষের মধ্যে একটা স্বভাবকবিত্ব সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বিরাজ করছে। চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি রচনার অনেক পূর্বেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত প্রাকৃত, অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করে বাঙালীর এই কাব্যচিন্তা প্রসার লাভ করেছে। কোন কোন পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলা দেশে কবির সংখ্যা নাকি এই শতকে পাঠকের সংখ্যাকেও অতিক্রম করেছে। সমালোচকও বলছেন, এদেশে যে পরিমাণ কবিতা জন্মায় সে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মালে অনেক বেশী মঙ্গল হোত। সমালোচকের এই ব্যঙ্গকে (?) অস্বীকার করে বলবো কাব্যচিন্তা বাঙালীর আজকের নয়, এ হোলো এ জাতির একটি পুরোনো সংস্কার, নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যেও এ সংস্কার বিলুপ্ত হয়নি, বরং তা দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গিয়ে আরো প্রসার লাভ করে এসেছে যুগে যুগে।

বাঙালীর কাব্যচিন্তার একটি দিক মূলতঃ বিভিন্ন মঠ-মন্দির প্রাচীন স্থাপত্য, বা পুরোনো প্রাসাদ—অট্টালিকার দেওয়ালে বিন্যস্ত অসংখ্য লিপিমালাকে অবলম্বন করে এগিয়ে এসেছে। মন্দিরের কথা যদি প্রথমেই ধরা হয়, তবে বলবো বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মন্দিরের লিপি সংস্কৃতে লেখা, বা ছন্দেবিন্যস্ত। বাংলা কাব্যলিপি বিশিষ্ট মন্দিরের সংখ্যাও অবশ্য নেহাৎ কম নয়। সংস্কৃত লিপির কাব্যমূল্য ছাড়াও—এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান। মঙ্গলকাব্যের কবি যেমন প্রহেলিকার মাধ্যমে কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করতেন, মন্দিরশিল্পিও তেমনি ব্যবহার করেছেন এমন প্রহেলিকাময় পদাবলী, যার অর্থ যথেষ্ট সুগম নয়। উদাহরণ স্বরূপ কোলকাতার বাগবাজারের মোড়ের আটচালা মন্দির, নিমতলা ঘাটের কাছে মদন মোহন দত্তের সুবৃহৎ আটচালা শিবমন্দির ভূকৈলাসের রক্তকমলেশ্বরের আটচালা মন্দির, ২৩নং টালিগঞ্জ রোডের কয়েকটি মন্দির, হুগলী জেলার মহানদে ব্রহ্মময়ীর নবরত্ন মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দির, মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ঘাটের চারচালা মন্দির, বর্দ্ধমান জেলার কালনার ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী মন্দির, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা টাউন, রাধানগর, নবগ্রাম, কাঁথির নিকটবর্তী বাহিরী গ্রামের কয়েকটি মন্দির, দাশপুর, ঘাটাল ও ঘড়ারের কয়েকটি মন্দিরের প্রাচীন সংস্কৃত লিপিমালার নাম করা যেতে পারে। বঙ্গদেশে এমন সংস্কৃত লিপিবিশিষ্ট মন্দিরের সংখ্যা কয়েক সহস্র।

বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রাচীন নবরত্ন মন্দির [দিনাজপুর বর্তমান পূর্ববাংলা] কান্ত নগরের কান্তনাথ মন্দিরের প্রাচীন সংস্কৃতলিপিটি এখানে তুলে ধরা হোল—

"শ্রীশ্রীকান্ত। শাকে বেদাব্ধিকাল | ক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ | প্রাসাদং
চাতিরম্যং সুরচিত | নবরত্নাখ্যমস্মিন্‌কার্ষীৎ | রুক্মিণ্যাঃ কান্দতুষ্টৈ সমুদিতমনসা |
রামনাথেন রাজ্ঞা | দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজগনরে | তাতসংকল্পসিদ্ধৈ ॥"

কোলকাতার ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনের সুউচ্চ নবরত্ন মন্দিরের লিপির অর্থ করা দুঃসাধ্য হোত,

যদি না শ্লোকের শুরুতেই "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শকাব্দা ১৭১৮ কথাটি লিপিরচয়িতা না দিয়ে যেতেন। লিপির পরবর্তী কাব্যাংশ হোল," শাকে অষ্টাদশ বাব্ধিচন্দ্রগণিতে কুম্ভস্থিতে ভাস্করে | রাধাকান্তমুদে শুভাশয়যুতে গঙ্গোপকণ্ঠস্থলে | আরব্ধং নবরত্নমেতদমল তদ্রামনাথেন দা | সেনাস্মিন্নবয়ুগ্মমৈত্রবিমিতে পূর্ণত্ব মাগাদ্দধৌ ॥"

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায় ৯১৩ শকাব্দে বর্দ্ধমানরাজ তেজচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের লিপির অর্থ তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য—"শাকেশ্রীশ্রীত্রিচন্দ্রে ধনপচনগৃহং সিদ্ধিথাতস্য খাতম্ | শ্রীমল্লেশবাসং প্রহরিগনগৃহং নাট্যজালয়ঞ্চ | ধর্মজ্ঞো ধর্মগেহং নবসদৃশ কৃতং শুচ্চসৌধং সুকৃতি শ্রীযুততেজশচন্দ্র ॥" ১৪৪৪ নির্মিত চন্দ্রকোনার অপর একটি মন্দিরের লিপি নিম্নরূপ—

"শাকেশ্রীযশ্বভূসে রঘুযদুবটে শাসন স্নানযাত্রা | বৃন্দা তৌর্যত্রিক শ্রীকপিধন সুথটী বাস্তরা-শালয়াদীন | কুপৌদ্যৌ বারিগেহাহ্যপলয় নবীয়ানি বৃত্তাপকার্ষীৎ | সীতাকুণ্ডস্য খট্টং নরপতি সুকৃতি শ্রীযুতস্তেজচন্দ্র ॥"

নদীয়া জেলার শিবনিবাসের অন্তর্গত ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত শিবমন্দিরে বিন্যস্ত লিপিটিতে বাঙালীর এক সুন্দর কাব্যগুণের পরিচয় মেলে—

"যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুজৈষ্ঠাদিশী শাংশকে | সেনানীসুথ বাজিয়াজবিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে | কৃত্বা মন্দিরসিন্দুরুশ্বিতশিবরং ভূপাল চূড়ামনিঃ | পৌত্রঃ শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্রনৃপতিঃ শম্ভু সমস্থাপয়ৎ ॥

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিপির মধ্যেও রচয়িতার রুচিপূর্ণ কাব্যচিন্তার পরিচয় মেলে—

"শাকে বারমতঙ্গবানহরিণ হরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং | সংস্থাপ্যাস্ত সুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনী-রোপণম্ | তস্মৈ সৌধমিদং সুদাস্থ জালদানিলী নলোলধ্বজং | তৎপাদেপিত ধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ ॥"

মন্দির লিপির কাব্যাংশে অনেকস্থলে 'ব' এর বদলে 'ধ' বা অসমীয়া ভাষার মত পেট কাটা 'ব' এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অসংখ্য রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার অধুনালুপ্ত রঘুনাথবাড়ীর একটি মন্দিরের শিলালিপি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দেওয়া হোল। এই সুবৃহৎ শিলালিপিটির আয়তন ২৪"×১২"। কালো পাথরে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির ছাঁদ প্রাচীন বিশুদ্ধ ভাষায় এটি রচিত এবং লিপির শেষে রচয়িতা ও খোদাইকারের নাম মেলে।

"শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭। শাকেহশ্বমুনিবানেন্দৌ
বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে
আরম্ভোহস্য বভুব হ। হরিনারায়ণভূপস্য পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীতৈ নবরত্নমি
দং দদৌ। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দ রসিকা শ্রীবীরভানের্বধূখ্যা
ত শ্রী হরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরায়াত্মজা। মাতা
শ্রীযুতমিত্রসেননৃপতে বিখ্যাতকীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ

শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ
মন্দিরং ॥ গিরিধারি পদাম্ভোজে নববত্নসি
দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতীমুদা ॥"
পৌরাণিক শ্রী মহন চক্রবর্ত্তী। গোকুল দাস ॥"

বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দিরের এই সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত লিপিসমূহ নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্য। অভিজ্ঞ ব্যক্তি যতক্ষণ না এর পাঠোদ্ধার করেন ততক্ষণ কিছু বোঝার উপায় নেই। যাঁরা এ সমস্ত লিপি রচনা করতেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট দখল ছিলো শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন তাঁদের মধ্যে একটা কবিত্বশক্তি ছিলো তেমনি ছিলো সংস্কৃত সংখ্যা শব্দগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিতি। তবে দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত লিপি যারা রচনা করতেন, মন্দির নির্মাতা বা প্রতিষ্ঠাতার নামের আড়ালে তারা ঢাকা পড়ে গেছেন। হয়তো এই সমস্ত পণ্ডিতকুল একদা বিভিন্ন রাজারাজড়ার সভা পণ্ডিতদের পদ অলংকৃত করতেন। আজ আর এঁদের সন্ধান জানার কোন সম্ভাবনাই নেই।

মন্দিরের সংস্কৃত লিপিমালা থেকেই আমরা জানতে পারলাম বাণ = ৫, অশ্ব = ৭, ক্ষিতি = ১, কাল = ৩, অদ্রি = ৭, নগ = ৭, যম = ২, দহন = ৩, নিশাপতি বা চন্দ্র = ১, খ = ০, সিতাংশু = ১, বেদ = ৪, পক্ষ = ২, কর = ২, মহী = ১, অঙ্গ = ৬, রস = ৬, সমুদ্র = ৭, অঙ্ক = ৯, ঋতু = ৬, শিবেক্ষন (শিবের চোখ) = ৩, বিয়ৎ (আকাশ) = ০, মুনি = ৭, শশী = ১, রত্ন = ৯, বসু = ৮, নেত্র = ৩, দিক = ১০, ইত্যাদি।

ইতিহাস নির্মাণে প্রাচীন লিপিমালার মূল্য সর্বাধিক। সুতরাং কাব্যগত দিক থেকে লিপির যেমন মূল্য আছে অনেক ক্ষেত্রে, তেমনি এর ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। এদেশের বেশী ভাগ মন্দিরে সংস্কৃত লিপি থাকলেও বাংলা লিপি বিশিষ্ট মন্দিরের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। প্রথমযুগে পোড়ামাটির এবং পরের যুগে মার্বেল পাথরের উপরে এই সমস্ত লিপি খোদাই করা হয়েছে। বাংলা পদ্যছন্দে রচিত এসব লিপি থেকে সেকালের বাঙালীর কাব্যচিন্তার একটি দিক খুঁজে পাওয়া যায়। এ সমস্ত লিপিকর সাহিত্য বা কাব্যে হয়তো এমন কিছু পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল না, হয়ত একজন লিপিকর একটিমাত্র লিপির ভাষাই তৈরী করেছেন, কিন্তু তারই মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যভাবনামুখর মনের প্রতিফলন।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার রাধাকান্তপুর গ্রামের বঙ্কিম্দাস পরিবারের পঞ্চানন্দের মন্দিরের পোড়ামাটির সুবৃহৎ লিপি ফলকটি বোধ হয় এদেশের সবচেয়ে বড় মন্দিরলিপি। এতবড় লিপি বাংলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা জানিনা [কারও জানা থাকলে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন]। সপ্তদশ শতকে চেৎবরদার অধিপতি শোভাসিংহের এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী সুললিত ছন্দে এই লিপিটিতে বিধৃত। লিপিটি সম্পূর্ণ হয়েছে মোট কুড়িটি দীর্ঘ সারিতে, দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দে রচিত—'রাধাকান্তপুরে বাস | নাম জগন্নাথ দাস | স্বর্গে বাস এই সে কারণে॥ মহামহাপুণ্যফলে | সপ্তপুত্র ক্ষিতিতলে | জৈষ্ঠপুত্র শ্যামদাস নামে॥ যিনি দাতা পুণ্যদয় | প্রকাশিত মহাশয় | মধ্যম তৃতীয় সহোদরে॥ বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া | গোপীনাথে আনাইয়া | স্থাপন করিলা এই ঘরে॥ নবাব পৃথিবীপতি | তার ভয়ে ব্যস্ত অতি | সীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড়॥ দামামা দরজাপরে | জয়চন্ডীর কৃপাবরে | পুষ্করিণী খুলিলা তার পর॥ সন্ধান পাইলা যদি | সভাসিংহ নরপতি | এই হেতু কড়া না আইসে | কম্পমান ক্রোধভরে | আজ্ঞাদিল অনুচরে | হান শির পদাতিক রোষে॥ বিপক্ষ হৈলা কাল | কালহৈলা পরকাল | কিছু না জানিল মহাশয় | তাহাতে ছেদিল মুণ্ড | দুর্গা দুর্গা ডাকে তুণ্ড | শুনি রাজা মানিল বিস্ময়॥ কবিতা করিতে তার | এইস্থানে আঁটা ভার | হইল দুই শতেক বৎসর | রীতিনীতি পিতৃকীর্তি | এই বংশে অদ্যাবধি | বন্দ নাই হতেছে সুন্দর॥ আপদ হৈল এথে | বৃক্ষ হইল মন্দিরেতে | সারাইতে সাধ্য নাহি কার | নারাণ দাসের বংশে | মধ্যমবাড়ীর অংশে | যজ্ঞেশ্বর জন্মেছিল সার॥ সন১২৫১ সালে | গোষ্ঠির সহিত মিলে | নানা যুক্তিকরে ভানে ভানে | কেহ বলে লয়া কর | কেহ বলে একেই সার | যজ্ঞেশ্বরের কিছুইনা লয় মনে॥ পিতৃকীর্তি ডুবাইয়া | কেমনে করিব ইহা সারাইব যা থাকে ভাগ্যেতে | ভদ্রলোক ডাকাইয়া | হীরু মিস্ত্রি আনাইয়া | উদ্যোগ করিল সারাইতে॥ সন ১২৬১ সালে | গোপীনাথের কৃপাবলে | মন্দির করিল মেরামতি | হিসাব করহ সবে | ইহাতে নিকাশ পাবে | কবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি॥

এত বড় কাব্যাংশ যে কোন মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ফলকে থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সুন্দর কাব্যাংশ যে কে রচনা করেছিলেন, তা আমাদের জানবার কোন উপায় নেই। অসংখ্য পোড়ামাটির অলংকার সহিত এই একরত্ন মন্দিরটি দর্শনের জন্য যাত্রা পথ সহজ। হাওড়া ষ্টেশন থেকে হাওড়া খড়্গপুর সেকশানের যেকোন গাড়িতে চড়ে পাশকুড়া ষ্টেশনে নামতে হবে। ওখান থেকে ঘাটাল রোড ধরে টালিভাটা স্টপেজে বাস থেকে নেমে রাস্তার ডান দিকে রাধাকান্তপুরের দাসেদের বাড়ী। ওখানেই মন্দিরটি অবস্থিত।

ঐ গ্রামের অপর একটি উৎকলীয় রীতির মন্দিরে ব্যবহৃত লিপিটিও দীর্ঘপদছন্দে রচিত—"শ্রীশ্রীকাশীশ্বর মহাদেব স্থাপন। শকাব্দ ১৭৬৭ সন ১২৫২ সালমাহ আষাড। জেই হেতু মহাদের কাশীশ্বর নাম | কমললোচনদত্ত গিয়েছিল কাশীধাম | পিতার কর্ম পারে কাশী গমন বাসনা | কিন্তু গিহে ভাত্রিগণ করিল মানা | প্রীত্যাগমনেতে সিব স্থাপন করিবে | কাশীগমনের ফল তাহাতে পাইবে | এই প্রকাশ হৈল কাশীশ্বর | মন্দীর সমান কাম মোদক কিংকর॥"

কোন কোন মন্দিরে সংস্কৃত লিপির পাশেই থাকে বাংলালিপি। এতে একদিকে যেমন সংস্কৃত লিপির অর্থ বোঝা যায় তেমনই নতুন কিছু তথ্যও সহজে মেলে। ৯৩ নং টালিগঞ্জ রোডের কয়েকটি মন্দিরের লিপি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মর্মর ফলকের এই লিপিগুলি নিম্নরূপ :—

(১) 'সকলের চরণে আমার নিবেদন | দেবালয়ে যাইবেন না করি আরোহন | নিষেধ বিধি কহি কিছু সভার অগ্রভাগে | গাড়ি পালকী ঘোড়া গজাদি নিষেধ আগে | পাদুকাপাদেতে আর শিরে ছত্রধরে | না যাইবে গঙ্গাস্নানে দেবের মন্দিরে | মুনিবাক্যে হেলন করে জাইতে জাহার মন | শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে অঙ্গন॥'

(২) মুরারীমুরলীদিত্রকুমার বদন | রত্নাকর সুধাকর শাকের গমন | কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণে | শুভারম্ভ সুরশৈবলিনী সন্নিধানে—রাশি সন্ধ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত | মধ্যে নবরত্নে শ্রীগোপাল বিরাজিত | বাল্যবেশে ননী আসে ভঙ্গী মনোহর | তুলনা কি দিব রূপ জিনি জলধর |

অত্রালয় নাম হলে হরিহর ধাম | প্যারিলাল দাশের আশা লইতে হরিনাম।'

দ্বিতীয় লিপির মধ্যে সুকৌশলে মন্দির নির্মাণের সাল তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুরারিমুরলীছিদ্র অর্থাৎ কৃষ্ণের বাঁশীর ছিদ্র = ৭, কুমারবদন = ৬, রত্নাদি বা সমুদ্র = ৭, সুধাকর বা চন্দ্র = ১ বাঁদিক থেকে অঙ্কগুলি সাজিয়ে নিলে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হয়। আর কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবস' কথার অর্থ হোল ২৭শে ফাল্গুন। প্রথমোক্ত লিপির মধ্যে ব্যবহৃত সহজ সরল ভাষা নজরে পড়ে আর দ্বিতীয় লিপিটি দেখেই বোঝা যায় এটি কোন বিদ্বজ্জনের রচিত।

বাংলার ১২৩৬ সালে নির্মিত হুগলী জেলার মহানাদে ব্রহ্মময়ীর নবরত্নমন্দিরের সংস্কৃত লিপির পাশেই যে বাংলা লিপিফলক আছে তা নিম্নরূপ—'ব্রহ্মময়ীর বাসজন্য নির্মিত | নবরত্ন পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত | পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি উর্দ্ধে এক শ্বেতসারি | দেখিবারে অতি সুশোভিত | শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম | অশেষ গুণে গুণে গুণধাম | সদ্‌গোপ কুলে উৎপত্তি | ভবসিন্ধু তরিবারে | সুযত্ন করি অন্তরে | কালীপদে করিয়ে প্রণতি।'

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার রঘুনাথবাড়ীর ঠাকুরবাড়ীর প্রধান ফটকের উপরিভাগেও সংস্কৃত লিপির পার্শ্বে যে বাংলালিপি দৃষ্ট হয়, তারও কাব্যমূল্য কম নয়—

রঘুনাথের শ্রীমন্দির রম্যমনহর |
লালজীর শ্রীমন্দির হনুমন্তঘর | ভোগালয় ধনালয় নাট্যরম্যাগার | বৃন্দাবেশ্ম রাশবেশ্ম পাকগৃহ আর | বাদ্যগৃহ প্রস্তর প্রাচীর যুগ্ম কূপ | স্নানগৃহ সীতাকুণ্ড তাউ অপরূপ | ধনবেশ্ম বাসগৃহের বারাণ্ডা যুগল | দ্বারিগৃহ পড়ি সব প্রভৃতি সকল | চন্দ্রকোনায় রঘুনাথ যদুনাথ প্রীতে | বর্দ্ধমান বণিনাৎ বিষ্ণুতে জগতে | নবোজ্জ্বল করিলেন নৃপ চক্রবর্ত্তী | শ্রীল তেজচন্দ্র নৃপ ধরাধৌতকীর্ত্তি | শিবাক্ষী শিবাস্থসিন্ধু শশী ইতি শকে অঙ্গনায় অংশুমানএকবিংশতিকে | সন ১২৩৮।

হাল আমলে হয়তো এর চেয়ে আরো উন্নত শ্রেণীর কাব্যচর্চা লিপি ফলকে পরিলক্ষিত হতে পারে। কিন্তু আজ থেকে দেড়শ বছর আগেকার লিপিফলকের এরূপ কাব্যচর্চা নিতান্ত সাধারণ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মন্দির ফলকে বাংলা লিপির ব্যবহার তুলনামুলক ভাবে কম থাকার অন্যতম কারণ হয়তো গ্রামীণ শিক্ষিত জীবনে বাংলা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য। যত সহজে সংস্কৃতে মন্দিরলিপি তৈরী হচ্ছে, বাংলা লিপি ঠিক সেভাবে হয়নি। তবে বাংলা লিপির বেশীর ভাগই কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, তাই তাদের কাব্যমূল্যও নেহাত কম নয়। সংস্কৃত রচয়িতারা সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন, তাই এদের কাব্যমূল্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক এবং গাণিতিক মূল্যই যেন বেশী করে নজরে পড়ে। সংস্কৃত লিপি দুর্বোধ্য। অপর পক্ষে বংলালিপি সহজে পাঠোদ্ধার করা যেতে পারে। তবে বলা বাহুল্য, যে কোন প্রাচীন লিপিফলকের পাঠোদ্ধার লিপিপাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

মন্দির বা মসজিদের প্রাচীন লিপি, ফলক ছাড়াও স্মৃতিস্তম্ভ প্রাসাদ বা কোন কোন শিল্পকীর্তিতে লিপিফলক বসনোর রীতি পুরোনোকাল থেকে চলে আসছে। স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে বসানো অসংখ্য লিপিফলকে একশ-দেড়শো বছর আগের বাঙালির রচিত সুন্দর কাব্যাংশ পরিলক্ষিত হয়। ব্যাকরণগত অনেক ত্রুটি হয়তো তাতে আছে, ছন্দপতনও হয়েছে, তবু তাদের কাব্যমূল্য বজায় আছে অনেকাংশে।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিস্তম্ভে (ভগবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে) বিন্ধৃত আছে এরূপ একটি কবিতা—

'হৃদয় করুণাসিন্ধু | অনাথ দীনের বন্ধু | পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, | তেজস্বী স্বাধীনচেতা | কর্তব্য নির্ভীক নেতা স্বদেশ বিদেশ পূজ্য নির্মল অন্তর | সেই সাধু মহাজনে | রাখিতে চিরস্মরণে | তাহার স্বদেশবাসী যত্ন আয়োজনে | ইষ্টকে নির্মাণ করে | দেশী শিল্পকর করে | প্রতিষ্ঠা করিল এই স্তম্ভ প্রীতমনে ॥' ঐ স্মৃতিস্তম্ভের অপর পার্শ্বে একটি সংস্কৃত লিপিখণ্ড দৃষ্ট হয়—'সর্বশাস্ত্রার্থতথ্যঃ স্বদেশহিততৎপর | পুরুষেযুত্তমো যশ্চ বিদ্যাবিতরণসুধীঃ | বঙ্গভাষা প্রতিষ্ঠাতা, দুঃস্থানাং পরমাশ্রয়ঃ | পতিপুত্রবিহিনা-নামবলানাঞ্চ রক্ষিতা | যশস্বীশ্বরচন্দ্রোহয়ং বিদ্যাসাগরপণ্ডিতঃ | সমাপ্তোদীক্ষানিয়মঃ দিব্যধাম্নিমহীরতে ॥' বাংলাদেশে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের জন্মস্থান বা লীলাক্ষেত্রে যেখানে যেখানে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিফলক, তাতেই উৎকীর্ণ হয়েছে নানা কাব্যকাহিনী।

ইতিহাস নির্মাণের যে সমস্ত প্রাচীন শিলামালা বা শিলালেখসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি অধিকাশ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। কিন্তু সেই সমস্ত প্রাচীন লিপির মধ্যেও সেকাল বাংলার কবিস্বভাবী মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইতিহাস নির্মাণে তাদের গুরুত্বের বিষয়টি বহু আলোচিত এবং বহু বিতর্কিত। কিন্তু তারই নীচে যে চাপা পড়ে গেছে ঐ লিপিগুলির রচয়িতাগণের সুনিপুণ কবিপ্রতিভা তা আর কারো দৃষ্টিতে পড়েনি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ঐ সমস্ত লিপির রচয়িতা কে ছিলেন বা তাঁর পরিচয়ই বা কি তা কিছুই জানার উপায় নেই।

গৌড়ে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল-এর পরিচয়বিশিষ্ট একটি তাম্রশাসন মালদহ জেলার খালিশপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবার থেকে উদ্ধার করে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন। এ থেকে রাজা গোপালের পরিচয় মেলে। মোট বারোটি স্তবকে এই পরিচিতি সুললিত ছন্দে বিন্ধৃত।

'শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ | সর্বাণীব শিবস্য গুহ্যকল্পতের্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা | পৌলমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দোদেবীত্যভূৎ | দেবী তস্য বিনোদভূমু রিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষমাপতেঃ ॥'

অর্থাৎ চাঁদের যেমন রোহিণী, অগ্নির যেমন স্বাহা, শিবের যেমন সর্বাণী, ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা, বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, সেই রাজার (গোপালদেব) দেদ্দাদেবী নামে চিত্তবিনোদনকারিণী প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। এমন সুন্দর উপমার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অবশ্য প্রাচীন লিপিমালায় বিরল নয়।

পালবংশের পরিচিতি সমন্বিত অপর একটি তাম্রশাসনের অংশবিশেষের বর্ণনাগুণ কাব্যরসাক্রান্ত—

'মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সী সন্দধানঃ | সম্যক সম্বোধিবিদ্যাসরিদলজলক্ষলিতাজ্ঞান-পঙ্কঃ | জিত্বা বঃ কানকারি প্রভবমাভিভাবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং | বা শ্রীমান লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ।" অর্থ করলে দাঁড়াবে, কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ে মৈত্রীকে যিনি প্রিয়তমারূপে ধারণ করেছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞানরূপ সমুদ্রের নির্মল জলে অজ্ঞানপঙ্ক ধৌত করেছিলেন, যিনি কামক শত্রুর ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিহত করে শাশ্বতী শান্তি লাভ করেছিলেন সেই দশবল রাজা

লোকনাথের জয় হোক; এবং যিনি কারুণ্যরত্ন-উদ্ভাসিতবক্ষে প্রজাগণের মৈত্রী ধারণ করে সম্যক সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান তরঙ্গিণীর নির্মল জলধারায় লোক সমাজের অজ্ঞান পঙ্ক ধৌত করে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী কামক শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করে রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর এক রাজাধিরাজ লোকনাথের জয় হোক।

এই গোপালদেবের পূর্বনিবাস সম্বন্ধে বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রলিপিতে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এর ৪র্থ শ্লোকে রাজা রামপালদেবের খ্যাতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা গেলে—'তস্যোজ্জ্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ পুত্রঃ পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্ | তেনে যেন ভাগত্রয়ে জনকভূ-লাভাদ্ যথা বস্তুশঃ ক্ষৌণী-নামক-ভীম-বারন-বধাদ্ব্যদ্ধার্ম্বোল্লঘনাৎ॥' অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র যেমন সমুদ্র অতিক্রম করে, রাবণ বধান্তে সীতাকে লাভ করেছিলেন রামপালদেও তেমনি যুদ্ধসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে পিতৃভূমি লাভ করে ত্রিভূবনে নিজের খ্যাতি বিস্তার করেছিলেন। বিহারের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি থেকে পাই—'বিজিত্য যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামেঘ পরিগ্রহা ইতি। সবাষ্পমুদ্বাষ্প-বিলোচনান্ পুনর্বনেষু বন্ধুন্ দদৃর্মতঙ্গজাঃ॥ চলৎস্বনন্তেষু বলেষু যস্য বিশম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ। পাদপ্রচার ক্ষমমন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচিরং বভূব॥'—রাজার অসংখ্য ধুলিধুসরিত হয়ে দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গগণের বিচরণের উপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তিনি সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবী জয় করার পর, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই বলে হস্তীগণকে মুক্তি দিলে তারা অরণ্যে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দের অশ্রু বিসর্জন করে স্বাধীন জীবন আস্বাদন করে।

দায়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও প্রখ্যাত যোদ্ধা বপ্যটের পুত্র গোপাল একসময় প্রজাগণের অনুরোধে গৌড়—মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর খ্যাতি ও শৌর্য্যের বর্ণনাবিশিষ্ট অপর একটি লিপিতে দেখা যায়—'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ | শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎ সুতঃ—যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশির্দিশামাশয়ে | শেতিম্না যদি পৌর্ণমাশ—রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥'—'মাৎস্যন্যায়' এর অশান্ত অবস্থা দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি যাঁর হাতে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করেছিলেন, পূর্ণিমা রাত্রির শ্বেতশুভ্র জ্যোস্না একমাত্র যার খ্যাতির স্থায়ী অনুকরণ করতে পারত, নরপাল কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যটের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কোন কোন লিপিতে দেখা যায় ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত লিপিকর সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন কোন পরাজিত সম্রাটের অন্তর্দাহের শোকদুঃখে দগ্ধ অন্তরের প্রতিচ্ছবি, কোন নিহত সম্রাটের রাণীর খেদোক্তি, অথবা কোন বিজয়ী নৃপতির সকাশে বিজিত ও বন্দী নৃপতির আত্মসমর্পণের সুন্দর বর্ণনা সুন্দর উপমায়। পর্বতের অঙ্গ থেকে যেমন করে হিমবাহ গড়িয়ে পড়ে সলিলরূপে গলিত হয়ে,—ধৌতকরে সেই উন্নতশীর্ষ ও আপনার মহোচ্চতার গরিমায় গর্বিত পর্বতের চরণযুগল, তেমন করে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বা নৃপতির পদতলে আশ্রয় প্রার্থনা করে বিজিত সৈন্যদল ও নৃপতি। বিজয়ী রাজার অনুগ্রহে ধন্য হয়ে হিমবাহরূপী সেই বিজিত রাজা আবার পরবর্তীকালে সেই বিজয়ী ও মহান রাজার যশকীর্তি গেয়ে চলে যুগযুগান্তর ধরে।

সিংহাসনে আরোহণ করে পালবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপাল প্রথমেই কান্যকুব্জ আক্রমণ করে সেখানে স্বীয় অধিকার বলবৎ করেন এবং কান্যকুব্জকে অপরূপ সৌন্দর্য-বিভূষিত রাজ্যশ্রী দান করেন। সে প্রসঙ্গে আলিমপুর তাম্রশাসনে লিপিকর লেখেন—'ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃকুরু-যদুযবনাবন্তি গন্ধার কীরৈ | ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি প্রণতি পরিনতৈঃ সাধু সঙ্গীর্যমানঃ | হৃষ্যৎ পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত কনকময় স্বাভিষেকোদককুম্ভো | দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জসসললিত চলিত ভ্রূলতা লক্ষ্ম যেন॥'—তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গিমায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন অবন্তি, গন্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন রাজাদের প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে 'সাধু সাধু' বলে কীর্তন করাতে করাতে হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করিয়ে কান্যকুব্জকে রাজ্যশ্রী দান করেন। মুঙ্গের থেকে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসনের একাংশে লিপিকর কবি বলেছেন, অপরাপর নৃপতিবৃন্দের শক্তিধ্বংসকারী সেই রাজার দিগ্বিজয় শেষ হলে রণহস্তীকুল স্বাধীনতালাভ করে অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হয়। যুবক অশ্বগণও কম্বোজ দেশে উপনীত হয়ে দীর্ঘদিন পর নিজেদের হ্রেষারব দ্বারা আপনাপন প্রিয়তমাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে।

প্রাচীন লিপিফলকের এ সমস্ত বর্ণনা কোন কোন অংশে এত সুন্দর রূপলাভ করেছে যা কোন অংশেই জয়দেব চণ্ডীদাস কালিদাসের কাব্যাংশের চেয়ে কোন অংশে অপকৃষ্ট নয়। বরং রাজন্যকুলের শৌর্য ও শক্তি বর্ণনায় তা এক আশ্চর্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

পালবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপালদেবের প্রধান অমাত্য ছিলেন গর্গদেব। পরবর্তীকালে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি পিতার পদ গ্রহণ করেন। একটি লিপিফলকে দেখা যায়, 'শ্রীদেবপাল দর্ভপাণির নীতিকৌশলে মতঙ্গজ মদাভিষিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা (নর্মদা) নদীর উৎপত্তিস্থান (বিন্ধ্যপর্বত) থেকে আরম্ভ করে মহেশললাট শোভি ইন্দুকিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক (হিমালয়) পর্বত পর্যন্ত, সূর্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিহত জলরাশির আধার পূর্বসমুদ্র এবং পশ্চিমসমুদ্র সমগ্র ভূভাগ করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।' আরো উল্লিখিত 'নানা মদমত্ত মতঙ্গজ মদবারি নিষিক্ত ধরণীতল বিসর্পি ধুলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করে, দিকচক্রাগত নৃপতিবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ যাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করে রাখতো সেই নরপতি দেবপাল, উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন।' গরুড়স্তম্ভলিপির পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের অর্থ করলে পাওয়া যায়, 'সুররাজকল্প [দেবপাল] রাজা সেই অমাত্যকে প্রথমে চন্দ্রবিম্বানুকারী আসন প্রদান করে, নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হয়েও নিজেই সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করতেন।' গৌড়েশ্বর দেবপালদেব, তাঁর অপর এক অমাত্য কেদারমিশ্রের 'বুদ্ধি বলের উপাসনা করে উৎকলবংশ উৎকীলিত করে, হুনগর্ব খর্ব করে এবং দ্রাবিড় গুর্জরনাম দর্প চূর্ণ করে, দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্র মেঘলাভরণাবসুন্ধরা উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।' 'যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালোনৃপঃ | সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃস্বয়ং | নানাম্ভোনিধি-মেখলস্য জগঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং | শ্রদ্ধাম্ভপ্লুতমানসে নতশিরা জাগ্রহ পুতস্পৃয়ঃ॥' অর্থাৎ 'সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহারকারী নানা সাগর মেঘলাভরণা বসুন্ধরার

চিরকল্যাণকামী রাজা শ্রীশূরপাল স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করেছিলেন।'

রাজা বিগ্রহপাল প্রসঙ্গে লিপিরচয়িতা বলেন, 'শ্রীমান বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ | শত্রুবণিতা প্রসাধন বিলোপিবিমলাসি জলধারঃ | রিপবো যেন গুর্বীনাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ | পুরুষায়ুষ দীর্ঘানাং সুহৃদঃ সম্পাদামপি।'[1] অর্থ করলে পাই, 'অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলো [জয়পালের]। বিমল জলধারার ন্যায় তাঁর বিমল অসিধারায় শত্রুবণিতাবর্গের অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদভোগের পাত্র এবং বন্ধুবর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎভোগের পাত্র করেছিলেন।'

গৌড়রাজ রামপপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র কুমারপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 'শোয়ং রামনরেন্দ্রজস্য শচিবঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীজুষঃ | প্রথ্যাতস্য কুমারপালনৃপতেশ্চিন্তাস্বরূপোহভবৎ | যস্যারাতি কিরীট হাট কৃত প্রাসাদ কণ্ঠরব | গ্রাস ত্রাস বশাদপৈষ্যতি বিধোর্বিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ'—সাম্রাজ্যলক্ষ্মীসেবিত সুবিখ্যাত রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিন্তাস্বরূপ মন্ত্রী হয়েছিলের তিনি। পরাজিত শত্রু নরপাল মুকুট সমাহৃত স্বর্ণনির্মিত যে সিংহমূর্তি তাঁর সমুচ্ছ প্রাসাদ শিখর অলঙ্কৃত করে চলেছে, সেই সিংহের গ্রাসভয়ে ভীত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ বিম্বাঙ্করূপী মৃগ পলায়নপর হবে।'

মন্ত্রী বৈদ্যদেব দক্ষিণবঙ্গের একটি নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। লিপিকর লেখেন—'যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গরজয়ে নৌবাটহীহীরব | ত্রস্তৈর্দিককরিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ | কিঞ্চিৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ | রাকাশে স্থিরতাকৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥'—'দক্ষিণ বঙ্গের যুদ্ধজয়ব্যাপারে চারিদিক থেকে সমুস্থিত তাঁর নৌবাট হী হী রবে সন্ত্রস্ত হয়েও দিগগজসমূহ গম্যস্থানের অসম্ভাবেই নিজের স্থান থেকে বিচলিত হতে পারেনি। উৎপতনশীল ক্ষেপনী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করতে পারলে চন্দ্রালোক কলঙ্কমুক্ত হতে পারতো।'

অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্ত প্রাচীন শিলালিপি, অনুশাসন বা লিপিফলক যেহেতু জটিল সংস্কৃতে (বা কোন কোনটি প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলায়) রচিত তাই তা যেমন দুর্বোধ্য তেমনি একহিসেবে ব্যক্তিবিশেষে রসহীনও বটে। সাম্প্রতিক আমলের রসসাহিত্যের প্লাবনে এগুলি অনেকাংশে নিষ্প্রভ বা মূল্যহীন বলে পাঠককুলের একাংশের কাছে মনে হলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের সাহিত্যের ভিত্তি এবং জন্মদাতাই হোল প্রাচীন লিপিমালা এবং তাতে বিধৃত কাব্যকাহিনী বা গাথা। আগেই বলেছি, হয়তো সমস্ত লিপিকরই ভাষাবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না। বিশেষ করে সব মন্দিরের বাংলা লিপিফলক অধিকাংশক্ষেত্রে মন্দির শিল্পীরাই তৈরী করে থাকবে। তবে সংস্কৃত লিপিকর একেবারে কাব্য ব্যাপারে যে অনভিজ্ঞ ছিলেন তা নয়।

এখন, আলোচনার শেষে একটি কথা মনে আসে। এ সমস্ত লিপিকররা কি সকলে বাঙালী ছিলেন না অন্যকোন রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন! এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া বা দেওয়া কোনটাই সম্ভব নয়। একে তো আমাদের ইতিহাস মতামতের দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত। একজন এক বলেন,

আর একজন তা খণ্ডন করেন। অথচ কেউ কোন অংশে কম নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যাবে, বাংলা দেশে যেহেতু এ সমস্ত লিপিফলক রচিত হয়েছিল বা পাওয়া গিয়েছিল তাই এর গঠনক্ষেত্রেও বাঙালীর শিল্পচেতনা বা কাব্যিক বৈশিষ্ট অনেকাংশে কাজ করে থাকবে তবে তার ব্যতিক্রমও হতে পারে।

নির্দেশিকা : 'গৌড়লেখমালা', 'গৌড়রাজমালা', শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষের 'গৌড় কাহিনী' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ও 'এপিগ্রাফিয়া ইনডিকার' বিভিন্ন সংখ্যা॥ পণ্ডিত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের বিভিন্ন রচনা॥

বাদশাহী সড়ক

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গাধার ওপর মাল চাপিয়ে পাহাড়ের পথে চলেছে এক দীনহীন ব্যক্তি—নাম হুসামুদ্দিন আইয়াজ। আফগানিস্থানের ঘুরবাজ্যের গরমশীর অঞ্চলের অধিবাসী। জাতিতে তুর্কী। গাধার ওপর মাল বইয়ে নিয়ে তার রুজি রোজগার। অত্যন্ত সাহসী। একদিন রুজি রোজগারের ধান্ধায় চলেছে হুসামুদ্দিন, পথে সাক্ষাৎ হল দুজন দরবেশের সঙ্গে। দরবেশরা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। তাঁরা খাবার চাইলেন হুসামুদ্দিনের কাছে। হুসামুদ্দিনের কাছে যা খাবার ছিল সবই সে দিয়েছিল দরবেশ দুজনকে। দাঁড়িয়ে থাকল তাঁদের কাছে বিনম্র হয়ে। দরবেশ দুজন তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'হুসামুদ্দিন তুমি হিন্দুস্থানে চলে যাও তুমি সেখানে রাজতক্তে বসবে।' হুসামুদ্দিন চলে এল হিন্দুস্থানে, যেমন তখন অসংখ্য তুর্কী আফগান ভারতের দিকে আসছিল ভাগ্যান্বেষণে। পথে দেখা হল—ইফতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন খালজীর সঙ্গে। উভয়ে একই পথের পথিক একই ধান্দা ভাগ্যান্বেষণ। এই বখতিয়ার খালজীর বঙ্গবিজয়ের কথা সকলেই জানেন। বাংলা প্রদেশের চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে তিনি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের হয়ে শোন অতিক্রম করে বিহার শরীফে উপস্থিত হন। এর পর গয়া ও ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে লখনোর বা বীরভূমের রাজনগরের ওপর দিয়ে নবদ্বীপে প্রবেশ করেন। তাঁর রাজ্য সীমা ছিল পুর্ণিয়া জেলা, দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম।

মহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী যখন অসুস্থ তখন তাঁর পুরাতন বন্ধু আলি ময়দান তাঁকে দেখতে এসে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। ইনি আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করে বাংলার সুলতান হন। তখন বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের লক্ষ্মনৌতিতে। যাই হোক হুসামুদ্দিন আইয়াজ সৈন্য সংগ্রহ করে শক্তি সঞ্চয় করেন এবং তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর ইনি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন, তাঁর উপাধি হয় ঘিয়াসুদ্দিন। হুসামুদ্দিন আইয়াজ ঘিয়াসুদ্দিন নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ১৪ বৎসর গৌড়ের সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ় অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বীরভূমের রাজনগর দখল করেন। কিছুকাল পরে আবার প্রবল যুদ্ধ হয় এবং উড়িষ্যা বাহিনী রাজনগর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ঘিয়াসুদ্দিন গৌড়ের সিংহাসনে বসে চিন্তা করলেন 'রাজ্য জয় করলেই সবকিছু করা হল না—তাঁর সুলতানী করার কথা জগৎকে জানান প্রয়োজন'। তিনি বাগদাদের খলিফা আল নাসিরুদ্দিন ইলাহির কাছে নতি জানিয়ে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করলেন। খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'আল নাসীর উপাধি খিলাত ও ফারমান পাঠিয়ে স্বীকৃতি জানালেন। ঘিয়াসুদ্দিনই প্রথম মুসলমান সুলতান যিনি খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁকে হত্যা করা হয়।

ঘিয়াসুদ্দিনের সবচেয়ে বড় কীর্তি বাদশাহী সড়ক। তিনি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে

(বর্তমান নাম গঙ্গারামপুর) বীরভূমের রাজনগর পর্যন্ত ১৬০ মাইল প্রশস্ত রাজপথ তৈরী করেছেন। তখনকার বর্ষায় পুরাতন পথঘাট ভেসে যেত। লোক ও সৈন্যচলাচল আরম্ভ হত। এই বাদশাহী সড়কের দুধারে ছায়া ও ফল দেবার জন্য গাছ রোপণ করা হয়। জলের জন্য ইন্দারা তৈরী করা হয়। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য সরাইখানা প্রস্তুত করা হয়। এই বাদশাহী সড়ক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বীরভূম, এই রাস্তার উপর রহিম খাঁর সৈন্যদের চলাচল দেখেছে। মারাঠাদের এই রাস্তার উপর যেতে দেখেছে। অনেক অভিযান এই রাস্তার উপর হয়েছে। বীরভূম জেলার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে এই বাদশাহী সড়কের অবশিষ্ট আজও দেখতে পাওয়া যায়। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিখ্যাত পথের ধারে একটি কুপ খনন করিয়ে দেন। আরবী ভাষায় লিখিত একটি উল্লেখনে জানতে পারা যায়।

বীরভূমের ইতিহাসে এই বিস্মৃত পথটি একটি ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। *

* ময়ূরাক্ষী পত্রিকা থেকে

আ লো চ না

সিল্ক-স্ক্রীন প্রসঙ্গে

আদিযুগের সিল্ক-স্ক্রীন যে কেন লিথো কিংবা লেটার প্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞাপনের জগতে আসন করে নিতে পারে নি তার কারণ এই সব প্রণালীর তুলনায় স্ক্রীনলব্ধ ছাপা ছিল অসমান ও তীক্ষ্ণতা-রহিত। এদিকে আধুনিক নান্দনিক দৃষ্টি আদিম সরলতা ও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে কালানুগ চাতুর্য ও পরাকাষ্ঠার সহাবস্থান প্রত্যাশা করে। সুতরাং বর্ণ সঞ্চারে একটি উগ্র আরণ্যক উচ্ছলতার আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেও সেই সঙ্গে আশা করা হয় সুডৌল হরফ, তীক্ষ্ণ অথচ মসৃণ মুদ্রণ, রেখার বিশ্বস্ত অর্থাৎ মূলানুগ প্রতিলিপি—এককথায় শিথিল অমার্জিত রূপের বদলে ছিমছাম স্মার্টনেস।

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো রাজ্যের এক স্ক্রীন শিল্পী অবশেষে ১৯২৯ সালে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে এই শিল্পের তৎকালীন ঐ ত্রুটি দূর করলেন। ভদ্রলোকের নাম লুই অট্রেমণ্ট এবং তাঁর অবদান হল একটি অভিনব ছুরিকাদীর্ণ স্টেনসিল ফিল্ম টিস্যু। এঁর এক সহযোগী এটিকে ‘প্রোফিল্ম’ নাম দিয়ে পেটেণ্ট করে নেন। ছুরি দিয়ে ষ্টেনসিল কেটে নকশা রচনার এই নতুন কৌশলে ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল। কয়েক বছরের মধ্যে জো উলানো নামে নুইয়র্ক শহরের এক তরুণ শিল্পী এই নতুন পদ্ধতিকে আরো বহুদূর এগিয়ে দিলেন। উলানো ‘ন্যুফিল্ম’ নামে একটি নতুন ফিল্ম বের করে পেটেণ্ট করেন। এইবার মামলা বাঁধল ‘প্রোফিল্ম’ উৎপাদকের সঙ্গে। আদালতের রায়ে উলানো হেরে গেলেন কিন্তু প্রোফিল্মের লাইসেন্স নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেলেন তিনি। এই সুযোগে স্বকৃত ফিল্মের স্বল্প সময়ে এতদূর উন্নতিসাধন করলেন যে সারা পৃথিবীতে উলানো অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন।

এই সঙ্গে স্ক্রীন শিল্পের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হল। এতদিন এই শিল্পের ব্যবসায়িক চাহিদা নিতান্ত স্বল্প ছিল বলে কালির কারবারীরা স্ক্রীন শিল্পের উপযোগী বিশেষ ধরণের কালি উদ্ভাবন করতে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু ন্যুফিল্মের আবির্ভাব পৃথিবীর কালি প্রস্তুতকারীদের যেন কান ধরে নতুন সম্ভাবনা, ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক নির্দেশ করল। দেখতে দেখতে স্ক্রীন শিল্পের উপযোগী কালিতে বাজার ছেয়ে গেল।

যতদিন এই মাধ্যমটি অপরিণত ছিল ততদিন কার্যোপযোগী কালি পাওয়া যায়নি, ফলে উৎপাদন ছিল সর্বাংশে কায়িকশ্রম নির্ভর এবং নিতান্ত মন্থর। যখন দ্রুত শুকিয়ে যাবার কালি এল তখন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ত্বরান্বিত তথা বর্ধিত করার পথে আর কোন বাধা রইল না। ঘণ্টায় দুই-তিন হাজার ছাপা যায় এমন স্বয়ংক্রিয় ছাপার যন্ত্রও আজ এই শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিন্তু সিল্ক-স্ক্রীনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় বহু উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতির যতই উন্নতি দেখা দিক, সেই সনাতন কাঠের ফ্রেমে সাঁটা স্ক্রীন মুদ্রণ কোনদিনই লুপ্ত হবেনা। পশ্চিমের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বয়ংক্রিয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় প্রায়ই সেখানে হাতে টানা

পদ্ধতিতে ছাপা হয়। এর কারণ এই পদ্ধতিটি মূলত হস্তচালিত কারুকর্মের অন্তর্গত। এবং সমাদরের কারণ, এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন রকম সামগ্রীর ওপর, যে কোন আয়তনের যে কোন বর্ণসংমিশ্রণের প্রয়োগে সবরকমের মুদ্রণতলে ছাপা। স্ক্রীনপ্রণালীর এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা এককভাবে পূরণ করতে পারে এমন কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন অসম্ভব। কিন্তু সনাতন ফ্রেমে সাঁটা পদ্ধতির অভিধানে অসম্ভব কথাটি নেই। ধরা যাক কিছুসংখ্যক কাপড়ের পতাকা ছাপতে হবে। এখন কাপড়ের দৈর্ঘ এবং প্রস্থের মাপ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে যে যে ব্যবস্থা করতে হবে তার শতাংশের একাংশ খরচ শুনলেই খরিদ্দার অন্যপথ ধরে এগোতে বাধ্য হবেন। কিন্তু হাতেকাটা প্রণালীতে যেহেতু অপচয় কম সেই কারণে খরচও অনেক কম লাগবে, অধিকন্তু যন্ত্রের বিনিয়োগ মূল্য লাগবে শূন্য। আসলে মামুলী কাজে যন্ত্র কোন যন্ত্রণা নয় বরং হিংসে করার মত সুবিধা এতে আছে। কিন্তু একটু সাধারণ কাজের বাইরে হলে যন্ত্র থেকে কোন সুবিধা আশা করা ঠিক হবে না। কাজের প্রস্তুতিতে ব্যবসার রস চলে যাবে। স্বীকার করি, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নতুন নতুন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এখনো প্রায়ই উদ্ভাবিত হচ্ছে কিন্তু আমাদের মত দেশে সেই যন্ত্র কি সমাদর পাচ্ছে বা পেতে পারে ?

সিল্ক-স্ক্রীনে ব্যবহারের জন্য বিদেশে যে ধরণের যন্ত্র দেখা যায় তা মূলত দুরকমের। প্রথমটা হল, দৈহিক শ্রম ব্যতিরেকে আগাগোড়া যন্ত্রের সাহায্যে কাজ হওয়া এবং দ্বিতীয়টি আধা-স্বয়ংক্রিয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রগুলিতে কোন কোন বিশেষ অঙ্গ স্বয়ং ক্রিয়, বাকি কাজ হাতে করতে হয়।

আমাদের দেশে মূলধনের অপ্রাচুর্যের কথা বিবেচনা করে কুটিরশিল্পের ঢঙে হস্তচালিত প্রক্রিয়ায় সিল্ক-স্ক্রীন ছাপার প্রচলন সম্ভবপর এবং বোধ হয় সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়। এই আলোচনায় বর্ণিত সঙ্কেত এবং কার্যক্ষেত্রে উদ্ভূত জিজ্ঞাসার সদুত্তর সংগ্রহ করে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করলে উৎসুক ব্যক্তি কিছুদিনের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য বা বাজারমানের স্ক্রীন ছাপা উৎপাদনে সক্ষম হবেন। কিন্তু প্রথমেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ হাতে নিলে হয়ত নিরাশ হতে হবে। যতদিন না পেশাদারী উৎকর্ষ আয়ত্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শখের কাজ অনবরত করে হাত পাকাতে হবে।

স্ক্রীন ছাপার প্রয়োগ ক্ষেত্র প্রায় অনন্ত। সেই সম্ভাবনাকে সবচাইতে বেশী কাজে লাগিয়েছে আমেরিকা। বিলম্বে এই শিল্পে হাত দিলেও বহু মৌলিক উদ্ভাবনের দ্বারা আমেরিকার কারুকৃৎ ও শিল্পীরা সিল্ক-স্ক্রীনকে উন্নীত করে একটি মুখ্য গ্রাফিক শিল্পে একে প্রতিষ্ঠা করেছে। শুধু উৎপাদন দিয়ে নয়, স্ক্রীনবিদ্যার প্রসারে এবং এই শিল্পের সংহতি সাধনে মার্কিনী প্রয়োগ সর্বাগ্রে নজরে আসে। ‘স্ক্রীন প্রসেস প্রিন্টিং এসোসিয়েশন, ইণ্টারন্যাশানাল’ নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর সব দেশের স্ক্রীন সাধকের উন্নয়ন ঘটেছে। শুধু স্ক্রীন শিল্পের কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা নয়, বিজ্ঞাপন শিল্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেমন করে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায় উক্ত এসোসিয়েশন সেদিকেও দৃষ্টি দেন। বলা বাহুল্য, এদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকা, নির্দেশিকা ও গ্রন্থাদি সিল্ক-স্ক্রীন বিদ্যার প্রশিক্ষণে প্রভূত সহায়তা করেছে।

পক্ষধর ভট্টাচার্য

স মা লো চ না

শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত—মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ॥ কলিকাতা ॥ ১৯৭৫ ॥ নমনীয় বাঁধাই ২০৲ ॥ শক্ত বাঁধাই ২৪৲ টাকা ॥

বাংলা ভাষায় শিল্পকলা সম্পর্কে পুস্তকের সংখ্যা বেশী নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পীর কয়েকখানি বিখ্যাত পুস্তক এবং বিশেষ করে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' বাংলায় শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই যোগ্য সমাদর পেয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' একদিকের আলোচনায় কিছু আলোকপাত করেছে। এরও আগে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত রচিত 'চিত্রদর্শন' ও আচার্য নন্দলাল সম্পর্কে লিখিত বই দুটি। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্রের 'ভারতীয় চিত্রকলা' এখন নিঃশেষিত কিন্তু এটি বাংলায় শিলচর্চা বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্বতেও প্রাচীন শিল্পকলা ও শিল্প নিদর্শনের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। এর পরেও আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটির প্রকাশক ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় নামক প্রকাশন সংস্থা। আর একটি বই 'যুগে যুগে ভারত শিল্প' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বহু রেখাচিত্রাদি নিয়ে। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত এই বইটিতে ভারতীয় ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার একটি সাধারণ ও সহজ ও প্রাঞ্জল বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং শিল্প সংগ্রহশালা পরিভ্রমণ সম্পর্কে একটি মূল্যবান পরিচ্ছেদে এছাড়া বহির্ভারতের শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে মানচিত্র সহযোগে। অধ্যাপক কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর 'বাংলার ভাস্কর্য' ও 'বাংলার লোকশিল্প' শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাঘ ও অজন্তা সম্পর্কিত সুন্দর বইটি এবং বহুপূর্বে লিখিত কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত শ্রীমনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা' এবং শিল্পী অসিতকুমার হালদারের ভারত শিল্প বিষয়ক কয়টি বইয়ের কথাও উল্লেখ করা যায়। বাংলার লোকশিল্প কারুকাজ, পোড়ামাটির অলংকরণ সজ্জিত আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আর বাংলার লোকজীবন ও লোকচিত্র কারুকর্মের ক্ষেত্রে আজও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' ও শ্রীগুরুসদয় দত্তের 'পটুয়া সঙ্গীত' প্রমুখ পুস্তক উল্লেখযোগ্য অবদান রূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

বাংলায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' নামাঙ্কিত আশ্বিন ১৩৬০ এ বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত তাঁর ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর পুস্তিকাটির লেখনভঙ্গী ও সাবলীল রেখাঙ্কনের জন্য। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে লেখনভঙ্গীর এই স্বচ্ছন্দ গতি এবং অনাড়ম্বর সহজ ভাব তাঁর এখনকার লেখা বইটিকেও আকর্ষণীয় করে তুলতে সমর্থ হয়েছে।

বইটিতে প্রাক বৈদিক যুগ থেকে দক্ষিণ ভারতের ধাতব শিল্প দিয়ে প্রথম ভাগে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাখা হয়েছে ভারতীয় চিত্রকলার কথা।

বহির্ভারতের শিল্পকলা এবং সমসাময়িক চিত্রকলা শীর্ষক দুটি নাতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদ রয়েছে বইটির শেষের দিকে।

লেখক স্পষ্টতঃ শিল্পবিচারে শিল্পবস্তুর দর্শনযোগ্য আকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রথম দুটি ভাগে। তৃতীয় ভাগটিতে প্রাধান্য পেয়েছে ভৌগোলিক বিচার। শেষপর্যায়ের আলোচনায় কালবিচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটি বিভাগের লেখকের আলোচনার রীতি স্মিথ হাডেল, কুমারস্বামী, ক্রমরিশ পন্থী। পুস্তকের বক্তব্য সংস্থাপনে কুমারস্বামীর পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে অধিকতর পরিমাণে। এ সম্পর্কে বেশী কিছু বলার অবকাশ নেই এখানে। তবে দেখে ভাল লাগল যে লেখক সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পীয় সংস্কৃতির নিদর্শনকে উপেক্ষা না করে গ্রন্থারম্ভে সেই সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। এই কথাটি বিশেষ করে বলতে হল এই কারণে যে বিদেশী ও বিভিন্ন 'পশ্চিমী প্রভুজাতির' পণ্ডিতেরা খানিকটা কুসংস্কার এবং কিছুটা হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচার করার সময়ে সিন্ধুর প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যকে একেবারে বাদ দিতে বা পৃথক করে রাখতে উৎসাহী। যদিও এখনকার নবতম আবিষ্কারে সিন্ধুসভ্যতার অঞ্চল যে ভারত উপমহাদেশের বিস্তৃত ভূভাগকে আবৃত করেছিল একসময়ে সেকথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

'সমসাময়িক চিত্রকলা' কথাটির অনেক ব্যাপক অর্থ হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্যই এ সময়ের একজন শ্রদ্ধেয় পথপ্রবর্তক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা অবশ্যই তাঁর প্রবর্তিত চিত্রধারা বা চিত্রশৈলীর অন্তর্গত নয়। কাজেই ভারত শিল্প যদি কেবল ঐতিহাসিক যুগের শিল্প আলোচনায় নিয়োজিত হত তাহলে আপত্তির কিছু ছিল না। অন্ততঃ এই বইটির ক্ষেত্রে। অবনীন্দ্র গগনেন্দ্র রচিত চিত্রকর্ম সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি ও বক্তব্যকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়নি। নন্দলাল সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। সমসাময়িককালে কালিঘাটের পটুয়ারা দেশী বিদেশী রীতি এবং মনোভাবকে মূর্ত করেছেন তাঁদের অপূর্ব তুলিকার টানে। একাধিক প্রথমশ্রেণীর ভারতীয় চিত্রকর যেমন যামিনী গাঙ্গুলী, শশী হেস প্রভৃতিরা বাংলায় ও বাংলার বাইরে সমসাময়িককালেই তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অতএব এঁদের বাদ দেওয়া হবে কেন সেটা সহজে বোঝা যায় না।

যদি আমরা প্রাচীন শিল্পালোচনায় গ্রীক রোমক ভাবধারা সম্পৃক্ত ভাস্কর্য নিয়ে লেখনী চালনা করতে গিয়ে পিছিয়ে না আসি অথবা মুঘল চিত্রের আলোচনায় যদি পারসিক বা ইরাণীয় ও পশ্চিমী বা ইউরোপীয় প্রভাব নিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত না হই তাহলে সমসাময়িককালে স্বদেশের পশ্চিমী ধারায় প্রভাবিত প্রতিভাধরদের শিল্প নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে বাধা কোথায় সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। পাটনা শৈলীর চিত্রকলা অথবা উনবিংশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় প্রভাব সম্পৃক্ত স্থানীয় চিত্রকলাকে যখন আমরা ভারতীয় শিল্পধারার মধ্যে স্থান দিই তখন এ বিষয়ে আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়।

আলোচ্য বইটিতে ভারতীয় শিল্পকলার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিতে আমাদের খুব বেগ পেতে হবে না। তবে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার যে গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের এত-শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যে শিল্পকলার অনেক

প্রায়ান্ধকার যুগ আমাদের কাছে আজ আর অপরিচিত নয়। পাঠান যুগের চিত্রকলা, দক্ষিণী ভিত্তি চিত্র, নেপালী পুঁথিচিত্রণ, নেপাল উপত্যকার ভাস্কর্য, পশ্চিম হিমালয়ের ধাতব কলা, সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্যএশিয়ার ভারত-প্রভাবিত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, গুপ্তযুগের পোড়ামাটির অপূর্ব কারুকাজ মণ্ডিত ভাস্কর্য, অজন্তের মধ্যযুগীয় পুঁথিচিত্র এরকম বহু বিষয় বইটিতে উল্লেখ করা হয়নি। বইটি বাংলা ভাষায় লেখা কাজেই একটা কথা বলতেই হল। বর্তমানে সমগ্র বাংলার প্রত্ন-ক্ষেত্রগুলির উৎখননে ও অনুসন্ধানে এত সুন্দর ও শিল্পসুষমা মণ্ডিত নিদর্শন সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে যে ভারত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি যুগকে বাংলার শিল্পকলা দিয়েই প্রমাণিত করে দিতে পারা যায়। চন্দ্রকেতুগড় বা তমলুক প্রভৃতির পোড়ামাটির ভাস্কর্য বাদ দিয়ে ভারত ভাস্কর্যের চর্চা করা হলে সেটি সম্পূর্ণ হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলার সুবিস্তৃত মধ্যযুগীয় প্রস্তরশিল্প ও মৃৎভাস্কর্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

আমরা আশা করব যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিতাংশ ও চিত্র সংস্থাপনকে আধুনিকতম নিদর্শনের বিবরণ দিয়ে সম্পূর্ণ কালোপোযোগী করেই প্রকাশ করা হবে। স্থাপত্যের বা চিত্রকলার ক্ষেত্রে বইটিতে শিল্পী লেখকের কয়েকটি রেখাঙ্কন থাকলে ভাল হত। মুদ্রণ পারিপাট্যের জন্য ও সাধারণ দক্ষতাপূর্ণ উপস্থাপনের জন্য বইটি গ্রন্থাগারে রাখবার উপযুক্ত। কারণ বাংলায় অবশ্যই শিল্প বিষয়ক পুস্তকের যথেষ্ট অভাব আছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যদি স্বল্পমূল্যে ভারতীয় এবং বঙ্গীয় ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, কারুকলা নিয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহলে উত্তম হয়। কারণ সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এসব বিষয়ের সুলিখিত বই নেই বললেই চলে। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' নামক পুস্তিকামালাতে এরকমের বই সহজেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সন্তোষকুমার বসু